বিশ্বসভ্যতা
বিনির্মাণে
মুসলমানদের
অবদান
অনুবাদ
আলী আহমাদ মাবরুর

বই সম্পর্কে

বর্তমান সময়ে পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রচারণা আর মিডিয়া ক্যাম্পেইন। মুসলমানদের কোনো অবদানকে স্বীকৃতি তো দূরের কথা; বরং ন্যূনতম স্বীকার করতেও নারাজ তারা। অথচ ইতিহাস সাক্ষী, এই মুসলমানদের অবদানের ওপর ভর করে প্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সভ্যতা পৌঁছে গিয়েছিল অগ্রগতির চরম শিখরে। শুধু তা-ই নয়; ইউরোপে যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়, তার নেপথ্যেও মুসলমানদের নানান সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের অবদানই সবচেয়ে বেশি।

তাদের ভাষ্য, ৭ম থেকে ১৫ শতক ছিল পৃথিবীর বুকে অন্ধকার সময়। অথচ বাস্তবতা হলো–এই সময়টি ছিল ইসলামি খিলাফতের স্বর্ণযুগ। তখন কোন বিষয়ে কাজ হয়নি–তা খুঁজে পাওয়া দায়। দর্শন, গণিত, মহাকাশবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইতিহাস, রসায়ন, আইন, বিচারব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞানসহ–সকল ক্ষেত্রে ছিল অভূতপূর্ব অগ্রগতি। তারা চায় আমাদের সোনালি ইতিহাস ভুলিয়ে নির্জীব করে দিতে, প্রেরণার উৎসগুলোকে লুকিয়ে রাখতে। প্রোপাগান্ডার ছাতায় ঢেকে রাখতে চায় আমাদের প্রসারিত দৃষ্টিকে।

এবার আমরা কি তাদের প্রচারণায় নিজের সত্তাকে বিসর্জন দেবো, নাকি চিন্তার মরীচিকাকে উপড়ে ফেলে অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে তাড়িত করে জেনে নেব আমাদের স্বর্ণালি ইতিহাস–সিদ্ধান্ত আমাদের।

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট থেকে প্রকাশিত 'Muslim Contribution to the World Civilization' বইটির অনুবাদ 'বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান'-এর কাজটি শেষ করতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। এ বইটি ট্রিপল আইটির গবেষণাধর্মী একটি অনবদ্য কাজ। তারা মুসলিম মানস সংকট নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই কাজ করে আসছেন। মুসলিমদের বিদ্যমান সংকটগুলোর একটি নেপথ্য কারণ হলো, তাদের হীনম্মন্যতাবোধ এবং পরিচয়ের সংকট। আর এই হীনম্মন্যতাটি তৈরি হয়েছে নিজেদের না জানার কারণেই।

ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, মানবসভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে পাইওনিয়ারের ভূমিকায় ছিল মুসলমানরাই। যারা মনে করে, মুসলিমরা তলোয়ারের জোরে একের পর এক দেশ দখল করেছে, এ বইটি তাদের ধারণায় পরিবর্তন নিয়ে আসবে, ইনশাআল্লাহ। এ বইটি মুসলিমদের বর্ণাঢ্য ইতিহাস ও গৌরবোজ্জ্বল কর্মকাণ্ডকে পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করে দেবে। বইটি পড়ে পাঠকেরা ধারণা পাবেন—গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থ, ভূগোল, জ্যামিতি থেকে শুরু করে এমন কোনো খাত বা সেক্টর নেই, যেখানে মুসলমানদের স্পর্শ পড়েনি।

বলতে দ্বিধা নেই, আজকের এ সময়ে এসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের উৎকর্ষতার মাঝে দাঁড়িয়ে আমরা সভ্যতার যে জয়জয়কার দেখতে পাচ্ছি, তার ভিত্তিমূল গড়ে দিয়েছিল মুসলমানরাই। মুসলমানদের সেই মহিমান্বিত কর্মকাণ্ডকে ইতিহাস আর বয়ানের মারপ্যাঁচে ফেলে গায়েব করে দেওয়ায় ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র আজ আমাদের কাছেই অজানা। এই বইটিতে হারিয়ে যাওয়া সেই স্বর্ণালি অধ্যায়কে নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়েছে। ইসলাম কখনোই বিজ্ঞান ও আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। আধুনিক শহরের ধারণা বিশ্বকে সবার আগে ইসলামই দিয়েছে। মানুষের জীবনমানকে উন্নত করেছে।

বিজ্ঞানকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। আমাদের অগ্রজরা যেমন দ্বীন ইসলামকে জানতেন, তেমনিভাবে বিজ্ঞানও। পরবর্তী সময়ে পার্থিব মোহ আর প্রতিপক্ষের চক্রান্তের কারণে আমরা দ্বীন ও ইলম দুটো থেকেই সরে যাওয়ায় সভ্যতার নিয়ন্ত্রকের আসনটি মুসলমানদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বইটির অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক কিছু জেনেছি। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমি আশাবাদী হয়েছি, স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। ইসলামের কাছে প্রত্যাবর্তন করলে আবারও সভ্যতার চালিকাশক্তি হওয়ার মতো রসদ যে আমাদের হাতে রয়ে গেছে—এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আশা করছি, 'বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান' নামক এ বইটি ইসলামপ্রিয় পাঠককে নতুন করে ভাবতে শেখাবে, উজ্জীবিত করবে।

এ বইটি অনুবাদের ভার আমার ওপর ন্যস্ত করায় প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স'-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। লেখালিখির জগতে বিচরণের শুরু থেকেই তাদের প্রেরণা ও সহযোগিতা আমার সাথে ছিল। আমার পরিবার বিশেষ করে আমার মা, স্ত্রী, সন্তানসহ পরিবারের সব সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা। যারা আমার সাথে থাকেন, প্রতিনিয়ত আমাকে সাহস আর উৎসাহ দিয়ে যান, তাদের প্রতিও নিরন্তর কতৃজ্ঞতা ও শুভ কামনা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নিন। আমরা যেন আবারও সভ্যতার চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারি। আমিন!

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা

সূচনা

বইটি রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য—মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস এবং সভ্যতার নির্মাণে মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা। সভ্যতা রচিত হয়েছে ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর বহু আগেই। সেই অনাদিকাল থেকে অনেক মানুষ মিলেই এই সভ্যতার সূতিকাগার তৈরি করেছে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে অবদানও রেখেছে। তবে এই বইটিতে সেই সব বরেণ্য মুসলিম বিশেষজ্ঞদের কথাই বলা হয়েছে—যারা বিভিন্ন মানবিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ; বিশেষত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে ৭ম শতক থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত সময়ে মুসলমান মনীষীদের অবদানকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুসলমানদের এসব অবদানের ওপর ভর করেই প্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, স্পেনসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সভ্যতা পৌঁছে গিয়েছিল অগ্রগতির শিখরে। এমনকী পরবর্তী সময় ইউরোপে যে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়, তার নেপথ্যেও মুসলমানদের নানান সৃষ্টিশীল কার্যক্রমের অবদানই সবচেয়ে বেশি। আর সভ্যতাকে ধারণ কিংবা সুরক্ষা করতে গেলে আমাদের মানবিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা রাখা জরুরি এবং নির্মাণ করতে হবে পরস্পরের মধ্যে একটি সুস্থ বিনিময়যোগ্য সম্পর্ক।

বর্তমানে পৃথিবীজুড়েই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রচারণা ও মিডিয়া ক্যাম্পেইন চলছে। এমতাবস্থায়, 'বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক বইটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন ভুল কিছু ধারণাকে সংশোধন করা হবে, তেমনি নতুন করে মানুষের সামনে হাজির করানো হবে ঐতিহাসিক কিছু সত্যকেও।

ইতোমধ্যে পশ্চিমারা আমাদের বর্ণালি ইতিহাসকে অনেকটাই বিকৃত করেছে। পশ্চিমারা সভ্যতা ও জ্ঞানের অগ্রযাত্রায় তৃতীয় শতক অবধি গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতদের অবদানকে স্বীকার করে। এরপর এক লাফে চলে যায় ১৫ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসপরবর্তী সময়ে। ৭ম শতক থেকে ১৫ শতক অবধি সমাজ, রাজনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছিল, তারা তাকে বেমালুম চেপে যায়।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মরোয়িজ অজ্ঞাত এই সময়টিকে 'ইতিহাসের কালো গহ্বর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের বর্ণনা শুনলে মনে হয়, রেনেসাঁস একেবারে ফিনিক্স পাখির মতো ছাই থেকে জন্ম নিয়ে রোম ও গ্রিক সভ্যতা থেকে এক লাফে এক হাজার বছরকে অতিক্রম করে ইউরোপে চলে এসেছে![১]

এই ধরনের অভিব্যক্তি মূলত ইতিহাসের জঘন্যতম বিকৃতি। এর বিপরীতে কারও যদি সভ্যতা নির্মাণে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে, তাহলে তিনি পশ্চিমা জগতের জাহেলিয়াতি ও মিথ্যা দাবিকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন। সেইসঙ্গে পশ্চিমারা মুসলমানদের সম্বন্ধে যে ধরনের সহিংস, বর্বর ও অসভ্য ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, তার বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম জবাব দিতে সক্ষম হবেন। একজন মানুষ সত্যিকারভাবে মুসলমানদের স্বর্ণযুগটিকে অনুধাবন করতে পারলে তিনি শুধু মুসলমানদের ইতিবাচক অবদান সম্পর্কেই জানবেন না; পাশাপাশি তার পক্ষে মানবসমাজের অগ্রগতির অনন্য ইতিহাস সম্পর্কেও জানা সম্ভব।

৭ম থেকে ১৫ শতক অবধি ইসলামি খিলাফতের স্বর্ণযুগ ছিল। তখন গোটা বিশ্ব অবাক চোখে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবিশ্বাস্য অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। সেই সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে মুসলিম পণ্ডিতরা তখন সমসাময়িক ও অতীতের সকল সভ্যতা; বিশেষত মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক, পারস্য এবং ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে জানার অবারিত সুযোগ পেয়েছিল। খলিফা ও মুসলিম চিন্তাবিদদের কঠোর পরিশ্রমের কারণে আরবি ভাষায় অনুবাদও করা হয়েছিল এই সকল সভ্যতার সমস্ত কীর্তিকে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সূত্র ও কৌশল নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। মুসলমান পণ্ডিতরা শুধু যে অতীতের জ্ঞান থেকে শিক্ষা অর্জন করে সেগুলোকে সুরক্ষা করেছিলেন তা-ই নয়; বরং এর ওপর ভিত্তি করে শুরু করেছিলেন মৌলিক গবেষণা। ফলে দর্শন, মহাকাশবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান ও দর্শনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়।

মুসলিম চিন্তক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব—সেই মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমগুলোকে নিয়ে অনুসন্ধান এবং এগুলোকে যত দূর সম্ভব মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া। লক্ষ্য—পরবর্তী প্রজন্ম যেন পূববর্তী সেই মহান ব্যক্তিত্বদের অবদানকে ভুলে না যায়; বরং বিজ্ঞান ও সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নয়নে তাঁদের রেখে যাওয়া অবদানগুলোকে স্বীকৃতি দিতে পারে। এই কাজের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অনেকেই মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে পূর্বসূরি মুসলিম পণ্ডিতদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান,

আইন ও বিচার, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং পশ্চিমের দৃশ্যমান উন্নতির পেছনে মুসলমানদের অবদান নিয়েও বেশ কিছু কাজ হয়েছে।

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও চিন্তক আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান মনে করেন—ইবরাহিম ﷺ-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম নামে যে দুটি ধর্ম বেরিয়ে এসেছে, মানবসভ্যতার উন্নয়নে এই ধর্ম দুটির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতায় পৃথিবী এখন অনেকটা হাতের মুঠোয়। তাই মানবতাকে জাগিয়ে তোলার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে অধিক বিস্তৃত দুটি ধর্মের—ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের সাদৃশ্যগুলোকে অনুধাবন করাটা অত্যন্ত জরুরি।

এই কাজটি করতে গেলে সবার আগে ইতিহাসের বিকৃত বর্ণনার কারণে সৃষ্ট সংকটগুলোর সমাধান করতে হবে। আন্তঃসাংস্কৃতিক সমন্বয়টাও জরুরি। আর এই ধরনের সমন্বয় করতে হলে অতীতে বৃহৎ এই দুই ধর্মের পণ্ডিত ও দার্শনিকরা যে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন, তারও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই মহান কীর্তিমানদের অবদানগুলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধকেও সংহত করতে পারব। তাতে বিশ্বে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যায়।

এই বইতে সাইয়্যেদ আহসানির যে কলামটি আছে, সেখানে মূলত আল মাওয়ার্দির চিন্তা-দর্শনের আলোকে ইসলামিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে ক্রমবর্ধমান পশ্চিমা আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তাবিদরা তিন ধরনের রাজনৈতিক পদ্ধতির সুপারিশ করেন। প্রথমত; বৈষয়িক গোষ্ঠী—যারা সরাসরি গণতন্ত্রের পশ্চিমা ধারণাকে ধারণ করার পক্ষে মত দেন। দ্বিতীয়ত, একটু রক্ষণশীলরা মনে করেন—পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধারাটি একটা সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। ফলে ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধগুলো হারিয়ে যাবে। আর তৃতীয় ধারাটি হলো উদারপন্থি—যারা মধ্যবর্তী একটি অবস্থান ধরে রাখতে চান। তারা পশ্চিমা ধারণার থেকেও যেমন কল্যাণকর বিষয়গুলো নিতে চান, একইভাবে ইসলামি শরিয়াহর মৌলিক ভিত্তিগুলোকেও একনিষ্ঠভাবে লালন করতে চান।

এই ধরনের বিভক্তি বা বহুমত নতুন কিছু নয়। এ ধরনের চিন্তাধারা আব্বাসীয় আমলেও দেখা গিয়েছিল; বিশেষ করে যখন মুতাজিলাদের 'যৌক্তিক তত্ত্ব'-এর উত্থান ঘটে। খলিফা আল মামুন নিজে এই চিন্তাধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা করায় অনেক মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যেই এই আশঙ্কা জন্মেছিল, মানুষের যৌক্তিক চিন্তাবোধকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওহির চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কি না।

সেই আশঙ্কা থেকেই আবার নতুন দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি হলো আহলে হাদিস—যারা একটু কট্টরপন্থি। এই ধারাটি সব ধরনের চিন্তা ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। অন্যটি আশারাইত; যারা যৌক্তিক বিবেচনাবোধকে স্বীকৃতি দিলেও তাকে সীমিত পর্যায়ে রাখার পক্ষে অবস্থান নেয়—যাতে কোনোভাবেই ওহির মর্মকথাকে পুরোপুরি বাতিল করা না হয়। মাওয়ার্দি প্রথম শরিয়াহর আওতায় রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তাঁকে আজও স্মরণ করা হয়।

এই বইটিতে দিলনেওয়াজ এ. সিদ্দিকি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তার শিরোনাম—'আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় মধ্যপ্রাচ্যে'। এই প্রবন্ধে তিনি উমাইয়া আমলের শেষ দিক থেকে শুরু করে গোটা আব্বাসীয় আমল এবং ১৫ শতক পর্যন্ত জ্ঞানের যে সম্প্রসারণ ঘটেছিল—তা পর্যালোচনা করেছেন। এখানে তিনি প্রমাণ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল কুরআনিক নির্দেশনার আলোকে। আর এ কারণেই তিনি আজকের সময়ের মুসলিম নারী-পুরুষকেও ব্যাপকভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করেছেন।

এ. সিদ্দিকির মতে—

> 'কুরআন ও দৃশ্যমান বিশ্বজগৎকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে অধ্যয়ন করলে অনেক নতুন ধারণার প্রবর্তন করা সম্ভব। অন্যভাবে বলতে গেলে, আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা প্রতিটি মুসলমানের ধর্মীয় দায়িত্বের আওতায় পড়ে। আর যে মুসলমান এই দায়িত্ববোধটি সঠিকভাবে অনুভব করতে পারে, শুধু তিনিই ওহি এবং যৌক্তিকতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে সক্ষম হন।'

তাওহিদের সত্যিকারের অনুসারীরা সব আমলের উদ্ভাবিত জ্ঞান ধারণেই আগ্রহী হন। একইভাবে তারা এমন একটি সামাজিক পরিবেশ গঠনেরও চেষ্টা করেন—যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই সব ধরনের ইতিবাচক জ্ঞান অর্জনের সুবিধা পায়। আর এ ধরনের পরিবেশ তৈরি করা গেলে একটি সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের সূচনা হয়। বিকাশ হয় সৃজনশীলতার। ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তৈরি হয় বিপুল আগ্রহ। সর্বোপরি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অধ্যায়ে কলা, গণিত, সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় মুসলমানদের অবদান এবং অষ্টম শতকের উল্লেখযোগ্য মুসলিম মনীষীদের কার্যক্রমগুলোকে দিন-তারিখের হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বইতে এম. বাসির আহমেদ 'সপ্তম থেকে ষষ্ঠদশ শতকে মুসলিম চিকিৎসক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের অবদান' শীর্ষক কলামটি স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের দীর্ঘ এই সময়টিতে কীভাবে মুসলিম পণ্ডিতরা বৈজ্ঞানিক সব অগ্রগতির প্রধান কুশীলবের ভূমিকা পালন করেছেন, তা তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। জ্ঞানের উন্নত শিখরে অবস্থান করায় মুসলিম এই মনীষীগণ মানবজাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখক প্রমাণ করেছেন, তৎকালীন যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের কাজগুলো ছিল খুবই মানসম্পন্ন। তাঁরা নিয়মিতভাবে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বিবেচনাবোধ এবং পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাজগুলোকে সম্পন্ন করে গেছেন। তাঁদের সময়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের চেতনার মধ্যে কখনোই স্বার্থের বৈপরীত্য বা সাংঘর্ষিকতা দেখা যায়নি। অথচ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে বরাবরই ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পড়ে একধরনের টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। এই টানাপোড়েনের পরিণতি হিসেবেই খ্রিষ্টান জগতে উত্থান হয় ধর্মনিরপেক্ষতার। এরপর চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়ের রাহু থেকে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের নানা অবদান ও সৃষ্টির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। যদিও ইউরোপিয়ানরা নিজেদের সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে মুসলমানদের এসব কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। তারা মুসলমান প্রভাবিত এই যুগটিকে 'ডার্ক এইজ' বা 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে তকমা দেয়। তবে এমনটা বললে মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না, মুসলিম ও মুসলিম সভ্যতার সাথে জ্ঞানের বিনিময় করার মধ্য দিয়েই ইউরোপীয় রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছে।

১৬ শতক পর্যন্ত অনেক মুসলমান শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর লেখা বই ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হতো। সেই সময়ে আরবি ভাষায় লিখিত অসংখ্য রচনা, প্রবন্ধ ও পুস্তকও ল্যাটিন ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ইরাক, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, ইরান, কর্ডোভা কিংবা কায়রোতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল, সেগুলোই ছিল পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্র। বিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসত।

প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক আল রাজি ও ইবনে সিনা ওষুধশাস্ত্রের ওপর যে এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো লিখেছেন, সেগুলোও ১৬ শতক অবধি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পড়ানো হতো। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ব্রিফল্ট বলেন—

'আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি, তা মূলত অসংখ্য গবেষণা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের ফলাফল। আর ইউরোপে বিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন মুসলিমরাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, তার সবটাই ইসলামিক সভ্যতার অবদান।'[২]

বাসির আহমেদ তাঁর রচনায় মুসলিম স্বর্ণযুগের বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেছেন।

বইতে আছে—লোওয়ে এম. সাফির একটি প্রবন্ধ। লোওয়ে এম সাফি তাঁর জীবনে মুসলিম ও অমুসলিম; দুটি সংস্কৃতিকেই দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি 'ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিভাজন অতিক্রম : সভ্যতায় ইসলামের অবদান' শীর্ষক কলামটি লিখেছেন। এখানে তিনি বলেছেন, আমরা ইসলামিক ও পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাস থেকে কতটুকু শিখতে পারব, তার ওপরই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তিনি লিখেছেন—

'যদিও কাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইসলামিক ও সভ্যতাকে অনেকটাই ভিন্ন বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই দুটো সভ্যতাই একই ধরনের বিশ্বজনীন কিছু মূল্যবোধ ধারণ করে। যেমন : সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্য, কল্যাণ, সমাজকল্যাণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আরও অনেকগুলো সাধারণ নীতিমালা ও মূল্যবোধ। পশ্চিমসভ্যতা তার সামাজিক কাঠামোকে এমনভাবে নির্মাণ করেছে, যাতে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেকগুলোকেই ধারণ করা যায়। তারা উল্লেখিত মূল্যবোধকে রীতিমতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

পশ্চিমা জগৎকে আজকের সফলতায় পৌঁছানোর জন্য দুটো ঐতিহাসিক অধ্যায়কে অতিক্রম করতে হয়েছে। একটি সামন্ততন্ত্র, আর অন্যটি সংঘবদ্ধ ধর্ম ও ধর্মচর্চা। এভাবে অতিক্রম করতে গিয়ে তাদের সেই নৈতিকতাকেই ঝেড়ে ফেলতে হয়েছে, যেখানে গাঁথা ছিল পশ্চিমা রেনেসাঁসের শিকড়। এর আগে, ইউরোপে আলোকিত ধর্মচর্চার প্রচলন ছিল—যেটা ছিল সাথে ইসলামিক মূল্যবোধেরও অনেকটা কাছাকাছি কিংবা সাদৃশ্য। কিন্তু পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা নিজেদের স্বার্থে সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত রাখাতে ধর্মীয় মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেয়।

পশ্চিমারা এমনটা করলেও ইসলামি চিন্তকরা কিন্তু তা করেননি। তারা বরং সব সময়ই নৈতিক মূল্যবোধকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার ওপরই গুরুত্বারোপ করেছেন।'

'ইউরো-আমেরিকান আইনশাস্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস : ইসলামিক বিকল্প' শীর্ষক কলামটি লিখেছেন পিটার এম. রাইট। এখানে তিনি সাবেক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক যুগের নীতিমালা এবং বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার প্রচলিত আইনি পদ্ধতিগুলোর সাথে ইসলামি শরিয়াহর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। তার মতে—পশ্চিমা আইনি পদ্ধতিগুলো বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তাই পশ্চিমারা সাধারণভাবে যে আইনি মতামতগুলো দেয়, তার অনেকগুলোকেই গভীরভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। রাইটের এই লেখাটিকে ইউরোপীয় আইনি দর্শনের ওপর সে ধরনের পর্যালোচনার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে মুহাম্মাদ শরিফের যে প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছে, তার নাম 'আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইসলামি অর্থনীতির উপযোগিতা'। লেখক এখানে বলেছেন, আধুনিক অর্থনৈতিক পদ্ধতিটি বেশ জটিল এবং তা ক্রমশই আরও জটিলতর হয়ে উঠছে। এতটাই জটিল, আধুনিক অর্থনীতি থেকে উৎপন্ন সমস্যাগুলোকে আর কোনোভাবেই সমাধান করা যাচ্ছে না।

মুহাম্মাদ শরিফের মতে—সমস্যা এতটা প্রকটতর হয়ে উঠার কারণ, আধুনিক অর্থনীতি মানবজীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়কে অগ্রাহ্য করে গেছে। আর তা হলো—রুহ বা আত্মার চাহিদা। আধুনিক অর্থনীতি বরং মানুষকে একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিয়েছে, যেখানে মানুষ ক্রমাগতভাবে সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় রত। ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক সমাজ এত বেশি সংকট তৈরি করছে, যা মোকাবিলা করার মতো আর কোনো পরিস্থিতি থাকছে না।

পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা একের পর এক কঠিন আইন প্রণয়ন করছে, আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তির ব্যবস্থাও রাখছে। কিন্তু মানুষ সম্পদ আর অর্থের মোহে এতটাই বেপরোয়া, তারা শাস্তির ভয় পাচ্ছে না এবং আইন লঙ্ঘন করতেও দ্বিধাবোধ করছে না।

এর বিপরীতে, ইসলামিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি খুবই সহজ, সরল ও সোজাসাপ্টা। সকলেই এই পদ্ধতিকে বুঝতে পারে। পাশাপাশি, ইসলামের আধ্যাত্মিক উপকরণগুলো মানুষকে ঐশ্বরিক ও কল্যাণকর কাজে সম্পৃক্ত থাকতে উৎসাহিত করে। ইসলাম এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যেখানে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক—উভয়ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতিটি সদস্য তার কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। ইসলামিক পদ্ধতিকে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারলে আধুনিক অর্থনীতির অনেক সমস্যাকে সহজেই নিরসন করা সম্ভব। ফলে শুধু গতানুগতিক প্রবৃদ্ধি নয়; বরং সমাজের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

মুসলিম বিশ্বে একটা সময়ে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে তার পতনও হয়েছিল। এর পেছনে বেশ কিছু কারণও আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— বাগদাদে মোঙ্গলদের আগ্রাসন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের আগ্রাসন এবং মুসলিম স্পেনের পতন। এই সংকটগুলোর কারণে মুসলিম বিশ্বের নামকরা শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে দুটো ভিন্ন ধারার শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন করা হয়; একটি হলো শরিয়াহ বা ইসলামিক আইনশাস্ত্র, অন্যটি উলুম আল আকলিয়াহ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই শিক্ষা পদ্ধতির অংশ হিসেবে অসংখ্য মাদরাসা চালু করা হয়, যেগুলোতে একটা সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চাকে নিরুৎসাহিত করা হতো। এসব মাদরাসায় শুধু ধর্মতত্ত্ব; বিশেষ করে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। এসব কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা এবং নতুন কিছু জানার আগ্রহ কমে আসে। সেইসঙ্গে ধর্মীয় উগ্রবাদ, মানসিক সংকীর্ণতা এবং সহনশীলতার ঘাটতির কারণেও এই অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

বিজ্ঞান নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো বিষয় নয়। ক্রমাগত বিবর্তনের ভেতর দিয়েই বিজ্ঞান অগ্রসর হয়। নানা জাতি, নানা গোত্রের মানুষই সেই অগ্রগতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। আমরা আশা করি, এই বইটি অনেক মুসলমানের জন্যই প্রেরণার উৎস হিসেবে আবির্ভূত হবে। বিশেষ করে মুসলিম যুবকরা এই বইটি পড়ে তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানতে পারবে এবং সভ্যতার উন্নয়নে পূর্বসূরিদের অবদান জানতে পেরে অনেক বেশি উৎসাহিত হবে।

—এম বাসির আহমেদ।

তথ্যসূত্র

১. H.J. Morowitz, 'History's Black Hole, Hospital Practice (May, 1992), pp-25-31)

২. Robert Briffault, *The Making of Humanity* (1938); reproduced in Islamic Science in the Medieval Muslim World (Pakistan: Khawarizmi Science Society website, November, 2001)

মুখবন্ধ

এই মুহূর্তে ইউরোপ ও আমেরিকা জ্ঞানের যে উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে, এর পেছনে মূল কারিগর হিসেবে তারা ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত গ্রিক ও রোমান সভ্যতাকে স্বীকৃতি দেয়। ইতিহাসের এই পাঠচক্রে তারা ৩০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে লাফ দিয়ে ১৫ শতকের রেনেসাঁসের সূচনালগ্নে চলে আসে। তবে পশ্চিমারা ইতিহাসের লম্বা একটি সময়কে যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাস কখনোই নীরব ছিল না; থাকার সুযোগও নেই। কিন্তু পশ্চিমাদের লেখা ইতিহাসগুলোতে খ্রিষ্টাব্দ ৩০০'র পর থেকে ১৫ শতক অবধি বিশাল এই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের বর্ণনা খুব সামান্যই পাওয়া যায়।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো—৭ম থেকে ১৫ শতক অবধি ইসলামি খিলাফতের স্বর্ণযুগ ছিল। বিশ্ব সে সময়ে অবাক চোখে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবিশ্বাস্য অগ্রগতিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। অন্যদিকে, সেই এক হাজার বছরে ইউরোপ ডুবেছিল যেন ঘন অন্ধকারে। এই দীর্ঘ সময়ে ইউরোপে বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিক্ষা বা অন্য কোনো খাতে তেমন কোনো অগগ্রতিই হয়নি। এর একটি বড়ো কারণ ছিল, চার্চগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা এবং উন্মুক্ত জ্ঞান চর্চার বিরোধিতা। এই সময়ে গ্রিক ও রোমানদের করা অনেক কাজই পাতালপুরীতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। ৩৯০ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়াতে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড়ো গ্রন্থাগারকে মৌলবাদী খ্রিষ্টানরা পুড়িয়ে দেয়। ফলে ক্লাসিক যুগের অসংখ্য জ্ঞাননির্ভর কাজ ও তথ্য সেখানেই হারিয়ে যায়।

মুসলিম শিক্ষাবিদরা এই কাজগুলো নিয়ে শুধু পর্যবেক্ষণ করেছে তাই নয়; বরং তারা নিত্য-নতুন গবেষণার মাধ্যমে নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যের প্রচলন করেছে। সেইসঙ্গে দর্শন, মহাকাশবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়েও তারা ব্যাপক গবেষণা করেছে এবং যুগান্তকারী সব কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে অবদান, তা রীতিমতো অসাধারণ এবং প্রচণ্ড মানসম্পন্ন। মুসলিম মনীষীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে এও দেখিয়ে গেছেন—দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বকে কীভাবে একসঙ্গে সমন্বয় করা যায়। তারা আরও প্রমাণ করেছেন, ইসলামের সত্যিকারের চেতনা ও ঈমানের সাথে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চার কোনো বিরোধ নেই।

একটি সংক্ষিপ্তসার
আরব মুসলমানরাই ভারতবর্ষ থেকে 'জিরো' সংখ্যার ধারণা নিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আবার লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি আরবি সংখ্যাতত্ত্ব শিখে তা গোটা ইউরোপে বিস্তার ঘটান। আল খাওয়ারিজমি নবম শতকে অ্যালগরিদমের আবিষ্কার করেন। আর বিশ্বকে সর্ব প্রথম ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে ধারণা দেন আবু আল ওয়াফা। চোখ ও চশমাবিদ্যার আবিষ্কার করেন আল হাইসাম। বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়ে মানুষের চোখে এসে পড়ে—এটাও আল হাইসাম আবিষ্কার করেন। এ ছাড়াও তিনি সর্বপ্রথম অপটিক বা দৃষ্টিসংক্রান্ত বিভ্রম, বাইনোকুলার বা দুরবিন দৃষ্টি, মরীচিকা, রংধনু এবং জ্যোতিষচক্র নিয়ে বিস্তারিত লিখে যান।

অষ্টম শতকে জাবির ইবনে হাইয়ান সালফিউরিক এসিড ও অন্যান্য বিশেষায়িত উপাদানগুলো প্রস্তুত করেন। নবম শতকে মুসলমানরাই প্রথম কাগজ প্রস্তুতি শুরু করে এবং কালক্রমে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে এই পদ্ধতিটি ছড়িয়ে দেয়। তাই সংবাদপত্র বা বইপত্র প্রকাশসহ বিশ্বজুড়ে যত কাজ এখন কাগজের মাধ্যমে হচ্ছে, তার প্রাথমিক কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে মুসলমানদেরই। প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রবর্তন এবং এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কাজ করেন। সিসিলিতে বসবাসরত মুসলিম শিক্ষাবিদ আল ইদরিসি মধ্যযুগীয় ইতিহাস এবং ইউরোপের ভৌগোলিক তথ্যসংবলিত পুস্তক রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি পৃথিবীর মোট ৭০টি মানচিত্র প্রণয়ন করেন। আল বেরুনি ও ইবনে বতুতা ছিলেন জগদ্‌বিখ্যাত পর্যটক ও ইতিহাসবিদ—যাদের রেখে যাওয়া কাজগুলো এখনও বিশ্বের ইতিহাস ও ভূগোলবিষয়ক অগ্রগতিতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউরোপে চালু হওয়ারও কয়েক শতাব্দী আগে মুসলমানেরা উন্নতমানের হাসপাতাল চালু করেছিল। এখন পৃথিবীতে যে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি চলছে, তার নেপথ্যেও মুসলমানদের অবদানই মুখ্য। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এসে স্যার উইলিয়াম অসলার কানাডা, ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মেডিকেল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদ্ধতি (ইন্টার্নশিপ) প্রচলন করেন। কিন্তু তারও বহু আগেই আরব মুসলমানরা হাসপাতালগুলোর ওয়ার্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টার্ন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল। পশ্চিমা মেডিকেল স্কুলগুলোতে এখনও যে পদ্ধতিতে পড়ানো হয়, তারও শিকড় পাওয়া যায় আরবীয় শিক্ষা পদ্ধতিতেই।

চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদানের কথা বলতে গেলে শুরুতেই বলতে হয়—দামেস্কের ইবনে আল নাফিস আল কারসির কথা। তিনি উইলিয়াম হার্ভের আবিষ্কারের ৩০০ বছর পূর্বেই রক্ত সঞ্চালনের তথ্য আবিষ্কার এবং এ সম্পর্কিত তালিকা প্রণয়ন করেন। গুটিবসন্ত ও হামের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন আল রাজি।

যক্ষ্মা যে একটি সংক্রামক ব্যাধি—এটা প্রথম অনুধাবন করেন আল তাবারি। মুসলিম স্পেনে আল জাহরাভি প্রথম অপারেশনের প্রয়োজনীয় উপকরণ আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম চোখের ছানিকে সরিয়ে দেওয়ার প্রচলন ঘটান এবং চোখের অপারেশনের নানা প্রক্রিয়া উদ্‌ঘাটন করেন। কোনো জায়গায় আঘাত পেলে রেশমি সুতো ব্যবহার করে কীভাবে ব্যান্ডেজ করা যায়, তা আবিষ্কার করেন ইবনে জুহুর।

ওষুধশাস্ত্রে মুসলমান মনীষীরা যে অবদান রেখে গেছেন, তার প্রভাব আজও বিদ্যমান। তাঁরা শুধু নানা ধরনের ভেষজ ওষুধ উদ্ভাবন করেছেন তা-ই নয়; বরং রাসায়নিক নানা নির্যাস বা নিষ্কাশনের যে তথ্য আমাদের হাতে আছে, এগুলোর সবই মুসলমানরাই আবিষ্কার করে গেছেন। বিশেষ করে পরিস্রাবণ, পাতন এবং স্ফটিকীকরণ (দানার মতো তৈরি করা)। ১৭ শতকে ইংল্যান্ডে বিভিন্ন ওষুধকে বিশেষায়িত করে *দ্য ফার্মাসোপিয়া অব দ্য লন্ডন কলেজ অব ফিজিসিয়ানস* (১৬১৮) নামে যে বইটি বের হয়, তাতে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদের ছবিও স্থান পায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাইপোক্রাইটস, গ্যালেন, অ্যাভেসিনা (ইবনে সিনা) এবং মেসুউ (ইবনে জাকারিয়া বিন মাসাওয়াহ)।

সর্বপ্রথম মুসলিম চিকিৎসাবিদরাই মেডিকেলের পাঠ্যপুস্তকের একটি কাঠামো দাঁড় করান—যা আজ অবধি অনুসরণ করা হয়। এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে যেমন প্রাচীন গ্রিকদের আবিষ্কৃত নানা তথ্য নেওয়া হয়েছে, তেমনই মুসলমান চিকিৎসাবিদদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলোকেও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যেসব চিকিৎসাবিদরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন আল রাজি (রেজেস, ৯৩২), আল জাহরাভি (১০১৩) এবং ইবনে সিনা (১০৯২)।

মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা ইউরোপে এমন একটি সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, যখন পুরো ইউরোপ ছিল অন্ধকারময়। ৭ম থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে অগ্রযাত্রা ঘটেছিল, তার ষোলোআনা কৃতিত্বই মুসলমানদের। সেই সময়গুলোতে মুসলমানরা যা করে গেছেন, তা মানব ইতিহাসে যুগান্তকারী প্রভাব স্থাপন করেছে।

মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের ওপর ভর করেই ইউরোপিয়ানরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রগতি অর্জন করেছিল। এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না—মুসলমানদের নানা আবিষ্কার ও গৌরবময় কর্মকাণ্ডের কারণে মানবসভ্যতার বিবর্তন ঘটেছিল এবং একই সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরও সূতিকাগার রচিত হয়েছিল। ১৬ শতক অবধি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকদের লেখা বই পড়ানো হতো। সে সময়ে আরবি ভাষায় লিখিত অসংখ্য রচনা, প্রবন্ধ ও

পুস্তকও ল্যাটিন ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ইরাক, সিরিয়া, মিশর, স্পেন, ইরান, কর্ডোভা কিংবা কায়রোতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল, সেগুলোই ছিল গোটা পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল শিক্ষাকেন্দ্র। বিশ্বের নানা অঞ্চল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করার জন্য আসত।

প্রখ্যাত মুসলিম চিকিৎসক আল রাজি ও ইবনে সিনা ওষুধশাস্ত্রের ওপর যে এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো লিখেছেন, সেগুলোও ১৬ শতক অবধি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পড়ানো হতো। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মোরাউইতজ এই প্রসঙ্গে বলেন—

> 'বর্তমানে আমেরিকায় যে ইতিহাস পড়ানো হয়, তাতে মধ্যযুগের অবস্থানটিতে বিশাল একটি গর্ত দৃশ্যমান। এই শূন্যতাকে কেন্দ্র করে আবার ইতিহাসের বিকৃত এবং অনভিপ্রেত একটি ছবিও আঁকা হয়।'

জর্জ সারটন (১৯৪৭)[২] মুসলিম মনীষীদের নিয়ে লিখতে গিয়ে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মনীষীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> 'এই সময়ের মুসলিম মনীষীরা বিশেষ করে আল রাজি, আল ফারাবি, ইবনে আল হাইসাম, আল খাওয়ারিজমি, ইবনে সিনা, আল বেরুনি এবং ইবনে খালদুন মেধা ও উৎকর্ষতায় অতুলনীয় ছিলেন।'

অন্যদিকে ব্রিফল্ট এই বিষয়ে লিখেন—

> 'আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি, তা মূলত অসংখ্য গবেষণা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের ফলাফল। আর ইউরোপে বিজ্ঞানের সূচনা করেছিলেন মুসলমানরাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি, তার সবটাই ইসলামিক সভ্যতার অবদান। আর মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সময়ে বিজ্ঞানকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল।'[৩]

২০০১ সালের জুনে টেক্সাসের ডালাসে 'অ্যাসোসিয়েশন অব মুসলিম সোশ্যাল সাইন্টিস্টস'-এর প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—'মানবসভ্যতায় মুসলমানদের অবদান।' এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা মানবতার জন্য কী কী তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছে, তা সমবেত দর্শক; বিশেষত মুসলমান ও অমুসলমান—সবাইকেই জানানো।

মানবসভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকেও উন্নত হয়নি, আবার হুট করে উনবিংশ শতকেও আজকের মতো উন্নত হয়ে যায়নি। আবার সভ্যতার এই অবদান একক কোনো গোত্র,

সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরও কৃতিত্ব নয়। অনন্তকাল থেকেই বহু মানুষই নিজ নিজ অবদানের মাধ্যমে মানবসভ্যতার অন্তর্নিহিত কাঠামো রচনা করেছে। সভ্যতাকে একটি বড়ো দালানের সাথে তুলনা করা যায়, যেখানে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী তাদের সাধ্যমতো অবদান রেখে একটি অবস্থান তৈরি করেছে।

উপরিউক্ত সম্মেলনে মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক ও মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। আর কীভাবে সেই অবদানের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছে কিংবা আজকের এই সময়ের দৃশ্যমান অগ্রগতির সাথে অতীতের সেই অবদানগুলোর সম্পর্ক কতটুকু, সেই বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়। সভ্যতাকে আমরা যদি সত্যিকারভাবে ধারণ ও সংরক্ষণ করতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে এবং পরস্পরের কাছে ইতিবাচকভাবে সেই ধারণাগুলোকে পৌঁছে দিতে হবে।

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিখ্যাত সব বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে যেই প্রবন্ধগুলো উপস্থাপন করা হয়, সেগুলোই এই বইতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, কলা, আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং সর্বোপরি পশ্চিমা জগতে প্রচলিত চিন্তাধারার ওপর, ইসলামের অবদানের ওপর এই পেপারগুলো উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এই সম্মেলনে প্রাসঙ্গিক আরও অনেকগুলো ইস্যু নিয়েও আলোচনা করা হয়। আমরা পরবর্তী সময় সেই বিষয়গুলো নিয়েও আরেকটা বই করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

তথ্যসূত্র

১. H.J. Morowitz, History's Black Hole, Hospital Practice (May 1992), pp-25-31)

২. George Sarton, Introduction to the History of Science, Vol-2, (Baltimore, MD: Carnegie Institute of Washington, William & Wilkins, 1947)

৩. Robert Briffault, *The Making of Humanity* (1938); reproduced in Islamic Science in the Medieval Muslim World (Pakistan: Khawarizmi Science Society website, November, 2001)

সূচিপত্র

ইসলামি সভ্যতা থেকে পশ্চিমাবিশ্ব যা নিয়েছে

আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমান

বর্তমান পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিলে মানবসভ্যতার যে বিস্ময়কর উত্থানের চিত্র ধরা পড়ে, তার নেপথ্যে মুসলমানদের অবদানকেও সচেতনভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং আদর্শের মধ্যে সহমর্মিতার সেতুবন্ধন রচনা করতে গেলেও এই ধরনের পারস্পরিক মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও তথ্য বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একবার গুগলে সার্চ দিয়ে আমি ৩ লাখ ৬ হাজারটিরও বেশি ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছিলাম।[১]

তাওহিদের পতাকাবাহী ইবরাহিম ﷺ-এর উত্তরাধিকারীরা এখন গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এখন স্বীকার করেন, এই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মানুষগুলোই মানব ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।[২] বলা হয়, গোটা পৃথিবীই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। এই বাস্তবতায়, অন্য সব পার্থক্যকে দূরে সরিয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মকৌশলের ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে যাওয়াটা এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে মানুষকে আধ্যাত্মিক চেতনা এবং নৈতিকতার দিকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কেবল তাহলেই মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক করা সম্ভব। একটি সমন্বিত চেতনার ভিত্তিতে কাজ করে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য—শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত এবং ইতিহাসের বিকৃতির কারণে

যেসব সংকটের জন্ম হয়, তার সমাধান করা। যদি পৃথিবীতে প্রকৃতপক্ষেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে ইবরাহিম ﷺ-এর উত্তরাধিকারীদেরই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।[৩]

আজ অবধি মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো ও কীর্তিমান সব প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে খ্রিষ্টান ও ইসলাম জড়িত থাকলেও এই দুটি চিন্তাধারা ও ধর্ম-দর্শনের বয়ানে পরবর্তী সময়ে যে বিকৃতি সাধন হয়েছে, তার পরিণতিতেই বিশ্বজুড়ে জন্ম নিয়েছে নানান সংকটের। খ্রিষ্টানরা একদিকে তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং অপরদিকে ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার নামে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে।

মূলত এই সব কৌশলের মাধ্যমে তারা খ্রিষ্টধর্মের মূল চেতনাকেই করেছে ভূলুণ্ঠিত। পরবর্তী সময়ে আবার খ্রিষ্টানরাই জাতীয়তাবাদের প্রবর্তন করেছে—যা মানুষকে কেবল নিজেদের ভিন্ন অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছে। এই ভিন্নতার চর্চা করতে গিয়ে পৃথিবীজুড়ে ঘৃণাবোধ এবং যুদ্ধ-সংঘাতের বিকাশ ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়; খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়েছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলামই মানুষকে অন্ধকার যুগ থেকে টেনে বের করেছে। শুধু তাই নয়; ইসলাম ব্যাপক জ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভর করে নতুন এক সভ্যতার জাগরণ এবং একত্ববাদের চেতনাকে ধারণ করে গোটা বিশ্বের মানুষকে একত্রিত করার প্রয়াস চালিয়েছে।[৪]

ইসলামের টেকসই আলোকবর্তিকা অন্য ধর্মের মানুষকেও তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রভাবের মাত্রা ছিল এতটাই বেশি, তারা ইসলামের কারণে শুধু ধর্মই পরিবর্তন করেনি; বরং অনেকেই নিজেদের ভাষা ও চিরায়িত প্রথা বা অভ্যাসকেও পালটে ফেলেছিল। মানব ইতিহাসে এ রকম ঘটনার দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—উত্তর আরব, উত্তর আফ্রিকা কিংবা পূর্ব আফ্রিকার ভাষা আরবি ছিল না, কিন্তু ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর তাদের ভাষাও আরবি হয়ে যায়। শুধু তাই নয়; মুসলিম মনীষীদের অবদানের কারণেই অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি সময় থেকে নতুন একটি উন্নত সভ্যতার ভিত রচিত হয়, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে সূচনা হয় ইউরোপে রেনেসাঁস এবং এনলাইটমেন্ট যুগের।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, ইতিহাসের ক্রমাগত বিকৃতি সাধন করে মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদানগুলোকে আড়াল করে ফেলা হয়।[৫] ফলে অন্য ধর্মের মানুষ তো বটেই, এমনকী মুসলমানরাও নিজেদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সেই আলোটিকে হারিয়ে ফেলে। তারা ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে নিজেদের পবিত্র চেতনা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাই কার্যত এখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই মুসলমানদের তাৎপর্যপূর্ণ কোনো অবদান আর দৃশ্যমান হচ্ছে না।

বৈশ্বিক এই গ্রামটিকে (গ্লোবাল ভিলেজ) যদি আবারও শান্তিপূর্ণ করতে চাই, তাহলে তাওহিদের চেতনার ভিত্তিতে আমাদের আবারও সেই হারানো বিশুদ্ধতা ও ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোকে। যদিও জাতিসংঘ যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, তারপরও বাস্তবতা হলো—জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫০ থেকে ২০০০ সাল অবধি বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই, শুধু কথাবার্তা বলে নয়; বরং শুদ্ধ চেতনাগুলোকে লালন করার মাধ্যমেই পারস্পরিক ভালোবাসা ও মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে। সর্বপ্রথম ইসলামই ভিন্ন ভিন্ন সব মানুষকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে সবর্জনীন স্বীকৃতি দিয়েছে।[৬] ইসলামই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে ভালো কাজ করার তাগিদ এবং এই ভালো কাজগুলো করার মাধ্যমে পরকালীন জীবনে অনন্ত সুখ ও সফলতা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।[৬]

খ্রিষ্টানদের মূল যে চেতনা, তা খ্রিষ্টানরা ধারণ না করলেও ইসলাম এও দাবি করেছে—সকল মানুষের সৃষ্টি একক একটি আত্মা থেকেই। মানুষের মধ্যে বাহ্যিকভাবে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাকে কেন্দ্র করে বিবাদে বা সংঘাতে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। একজন মানুষ বা একটি গোত্র অপর কোনো মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চাইবে—তা-ও কাম্য নয়। মানুষকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে বিবাদের জন্য নয়; বরং পারস্পরিক মতবিনিময়ে জন্য। সবাই যদি একই হতো, তাহলে তো বিনিময়ের প্রয়োজনই পড়ত না।

আমরা যখন নিজেদের ভিন্নতাগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখি, তখনই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গঠনমূলক অবদান রাখতে পারি। প্রকৃতিগতভাবেই কেউ কেউ ইতিবাচক আবার কেউ-বা নেতিবাচক হয়। কেউ পুরুষ হয় আবার কেউ-বা মহিলা। এই ভিন্নতাগুলো এ কারণেই রাখা হয়েছে—যাতে আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছ থেকে উপকার পেতে পারি।

ইসলাম কখনোই ভাষা বা শরীরের রঙের ভিন্নতাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলে ভাষা ও গায়ের রঙের দোহাই দিয়ে একজনের ওপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা কিংবা কাউকে ছোটো করার বিষয়টিকেও ইসলাম অনুমোদন দেয় না। মূলত এই ভিন্নতাগুলো আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির অনুপম নিদর্শন। তাই ভিন্নতাগুলোকে ইতিবাচকভাবেই দেখা উচিত।

খ্রিষ্টধর্ম ও ইসলাম উভয়ই ন্যায়বিচার ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।[৭] আমাদের সব সময়ই সবার প্রতি, এমনকী আমাদের শত্রুদের প্রতিও ন্যায়বিচার করা উচিত। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ইসলাম মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করেছে। ইসলামের কারণে যেখানেই যুদ্ধ করতে হয়েছে, ইসলাম সেখানেই জনগণকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। যারা এই স্বাধীনতাকে অনুমোদন করেছে, ইসলাম তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে গিয়েছে। আর যারা মানুষের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছে, মুসলমানরা শুধু তাদেরই সেই অপচর্চা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে।

এই পৃথিবীতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের শান্তি ও স্বাধীনতার দর্শনের চর্চা করতে হবে। পরস্পরের প্রতি হতে হবে সহনশীল। যখন একজন মানুষ সঠিক কাজটি করতে পারে এবং ভুল কাজটি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনতা তখনই নিশ্চিত হয়। স্বাধীনতা চর্চার মধ্যে যদি নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং মানবতার কল্যাণ না থাকে, তাহলে বরং সেই স্বাধীনতার কারণে সভ্যতার আরও পতন হয়। এ কারণে বিশ্বাসী প্রতিটি সম্প্রদায়েরই এই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যাপিত জীবনে ঐশ্বরিক বার্তাগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করা উচিত। সর্বোপরি ভালোবাসা, মায়া, মমতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তোলা জরুরি।

তথ্যসূত্র

১. www.kisarazu.ed.jp/alt/handbooks/cross_culture.htm (Google, 2004)

২. Jerald F. Abraham Dirks, *The Friend of God* (Beltsville, MD: Amana Publications, 2002), p.1.

৩. www.ummah.com/forum/archive/index.php/t-4689.html, 2004.

৪. Al-Faruqi, Ismail R, *al_Tawhid: Its implications for Thought and Life* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 1992), pp: 78-79

৫. Norman F. Cantor, *The Encyclopedia of the Middle Ages* (New York: Viking, 1999) pp. 349-350

৬. Ataullah Siddiqui (ed.) Ismail Raji Al Faruqi, *Islam and Other Faiths* (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1998), pp-28, 146, 153

৭. Walter Benjamin Franklin Isaacson, *An American Life* (New York: Simon & Schuster, 2003)

৮. Quran: Sura An Nisa: Verse 58 & Sura Al Aaraf: Verse 29

ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বিভেদ অতিক্রম : সভ্যতায় ইসলামের অবদান—লোওয়ে এম. সাফি

সামাজিক অস্তিত্ব এবং মতবিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তিপর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপিত এবং পারস্পরিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানকে প্রসারিত করতে কিংবা সমাজকে এগিয়ে নিতে ভাষা অত্যন্ত অপরিহার্য একটি উপাদান। আবার এর বিপরীতে এটাও সত্য, ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিরোধ ছড়ায়, ভুল বোঝাবুঝি বাড়ে, সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ভাষার অপপ্রয়োগে কখনো কখনো এমন শক্তিশালী পরিস্থিতির উত্থান হয়, যা সব ধরনের সামাজিক সংহতিকেও বিনষ্ট করতে পারে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও বিনিময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভাবনা ও আচরণের ওপর ভাষার প্রভাবটি বেশি দৃশ্যমান হয়।

তবে এক্ষেত্রে ভাষা বা সংস্কৃতির মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ আছে। যেমন : কয়েকজন মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন হলে তাদের মধ্যে কি চিন্তার আদান-প্রদান হতে পারে? কেননা, অভিজ্ঞতা আলাদা হলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা হওয়া স্বাভাবিক। তারপরও এই ধরনের তাত্ত্বিক লেনদেন কতটা বাস্তব? ধর্ম ও অভিজ্ঞতার মাঝে যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, তার ভিত্তিতে ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়ই অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

এই বিষয়গুলোকে সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাপকাঠিতে ছাড় দেওয়ার কিংবা আদান-প্রদান করার সুযোগ হয়তো কম। সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতার ভিন্নতার কারণে একে অপরকে ভুল বোঝার অবকাশও তুলনামূলক বেশি। তাই কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ওপর যদি ঐতিহাসিক উপাদানগুলোকে মাত্রাতিরিক্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেও নানা সংকটের জন্ম দেয়। এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তরসূরিদের উন্নতি ও বিকাশের মাত্রাও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপরিউক্ত জটিলতাগুলো থাকা সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি, যেকোনো বোদ্ধা ও চিন্তাশীল মানুষের; বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষাবিদ ও চিন্তকদের সাথে অন্যান্য ধারার চিন্তাবিদদের মধ্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাসংক্রান্ত চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক লেনদেন হওয়া প্রয়োজন। একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমার মুসলিম ও পশ্চিমা—দুটো সংস্কৃতিকেই খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি মনে করি, এই দুটো সংস্কৃতিই একে অপরকে জানার ও বোঝার মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে উপকৃত হতে পারে। আরও মনে করি, ইসলামিক ও পশ্চিমা সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কতটা শিখতে পারছি এবং এগুলোকে কতটা সফলভাবে কাজে লাগাতে পারছি, তার ওপরই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ কাঠামো অনেকখানি নির্ভর করে।

যদিও কাঠামোগত দিক থেকে ইসলামিক ও পশ্চিমাসভ্যতার মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব, তা সত্ত্বেও এই দুটো সভ্যতাই কিছু সর্বজনীন মূল্যবোধ ধারণ করে। এর মধ্যে অন্যতম—সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতা, জনকল্যাণ, সমাজকল্যাণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। পশ্চিমা সভ্যতা তার সমাজ কাঠামোকে এমনভাবে নির্মাণ করেছে, তাতে এই মূল্যবোধগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধারণ ও লালন করা হয়। মূল্যবোধগুলোকে তারা ব্যাপক অর্থে সামাজিকীকরণও করেছে। এই সফলতা অর্জনের পেছনে পশ্চিমা সভ্যতাকে দুটো বিব্রতকর ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। একটি সামন্ততন্ত্র এবং অন্যটি সংঘবদ্ধ ধর্মীয় পরিকাঠামো, যা চার্চগুলোর মাধ্যমে আরোপিত হয়েছিল। পশ্চিমাজগতে পরবর্তী সময়ে রেনেসাঁস তথা শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে এই জাতীয় নৈতিক বাধ্যবাধকতাগুলোকে উচ্ছেদ করা হয়।

অন্যদিকে, ইসলাম এমন একধরনের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, যার সাথে রয়েছে আধুনিকতার ব্যাপক যোগসূত্র। ঐতিহাসিকভাবেই ইসলাম বিশ্বসভ্যতার যে কাঠামো নির্মাণ করেছে, তাতে ধর্ম ও বিজ্ঞান যৌথভাবে সহাবস্থান করে

মানবজাতির অগ্রগতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রশ্ন হলো—এখন আমরা যে অস্থির সময় পার করছি কিংবা উত্তর আধুনিক যুগে অনৈতিকতার চর্চা যেভাবে বেড়েছে, ইসলাম কি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? ইসলাম কি এই ক্ষয়িষ্ণু আধুনিক সমাজে পুনরায় নৈতিকতার প্রসার ঘটাতে সক্ষম?

সাধারণভাবে এই প্রশ্ন শুনে অধিকাংশ মুসলমানই বলবে—'হ্যাঁ, ইসলাম আজকের সময়েও নৈতিকতাকে ধারণ ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।' যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের এখন ইসলামিক নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিরূপণ করে এগুলোকে আধুনিক সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কৌশল আবিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম পণ্ডিতদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদার্পণ এবং সমাজেও নিজেদের অবস্থান তৈরি করা জরুরি। আর এ কাজগুলো করতে হবে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকেই। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করব। বিশেষ করে ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং উদারবাদের বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করব।

আমার মূল কথা হলো, ইসলামের প্রচলিত বিধিবিধানের মধ্যেই রাজনীতির একটি শিকড়কে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তবে ইসলামের এই রাজনৈতিক চেহারাটি সংকীর্ণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত। ইসলামি চিন্তাধারা কিংবা দর্শনে সংকীর্ণতার কোনো স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে যেমন নৈতিকতাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, ইসলামিক ধারার রাজনীতিতে তেমনটা করা হয়নি। এখানে বরং চেষ্টা করা হয়েছে নৈতিকতাকে আরও শক্ত-সবল করার।

এই পর্যায়ে বলতে চাই, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের বিদ্যমান সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আন্তঃসংলাপ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও পরিচালনা করা জরুরি। তাহলেই ব্যক্তি ও সম্প্রদায় উভয়ের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত এবং রাষ্ট্রের মাত্রাতিরিক্ত খবরদারির ক্ষমতা সীমিত হবে।

ধর্ম ও রাজনীতির অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বাড়াতে হলে সবার আগে আমাদের ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে সম্যক ধারণা রাখা জরুরি। আমি পরবর্তী আলোচনাগুলোতে ধর্ম ও রাজনীতির সীমানাকে সঠিকভাবে মেনে চলার চেষ্টা

এবং একই সঙ্গে যে কয়েকটি জায়গায় ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পরের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে, সেগুলোকেও আলাদাভাবে নির্ণয় করব।

ধর্ম মানুষের জীবনের সেই আঙ্গিকগুলোকে নিয়েই কথা বলে, যার ভিত্তিতে মানুষের অস্তিত্বের বিষয়টিই প্রতীয়মান হয়। ধর্ম মানুষের অস্তিত্বের বিষয়ে তিনটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। যথা : মানুষের উৎস বা উৎপত্তি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য। যদিও এই তিনটি প্রশ্নকে দার্শনিক চিন্তাধারার আলোকেও ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হলো—এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে ধর্ম ও দর্শনের বক্তব্য অনেকটা আলাদা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে অপরের পরিপূরকও হয়ে যায়। মানুষের উৎস, উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের বিষয়ে ধর্ম যে বয়ানগুলো দেয়, তার পেছনে প্রায়শই যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়, সেগুলোকে আবেগনির্ভর। আর সেই কারণেই ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে দর্শনের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা সবক্ষেত্রেই যুক্তিকে খুঁজে বেড়ায়, কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের তুলনায় ধার্মিক ব্যক্তিরা বেশি স্বাভাবিক থাকতে পারে। শুধু তাই নয়; এই ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মের প্রয়োজনে অনেক বেশি ত্যাগও স্বীকার করতে পারে।

ধর্মের শক্তির উৎস যেখানে, ধর্মের দুর্বলতাও সেখান থেকেই সৃষ্টি। মানুষ যদি ধর্মীয় কারণের তুলনায় তাত্ত্বিক কারণে বেশি ভুল করে, তাহলে তাকে সংশোধন করা সহজ। অংশীদারিত্বমূলক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, সমাজে অনেকগুলো ধর্মের অস্তিত্ব থাকলে, সেখানে যদি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক না থাকে, তাহলে বরং সংঘাত ও সহিংসতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্কটি ভারসাম্যপূর্ণ নাকি সংঘাতমূলক—এটা এখন আর কোনো জরুরি প্রশ্ন নয়। কেননা, এই দুটি বিষয়ের অস্তিত্ব এখন অনিবার্য বাস্তবতা; বরং কোন ধরনের পরিস্থিতি বজায় থাকলে ধর্মীয় চেতনাগুলো সামাজিক জীবনকে আরও উন্নত ও সংহত করতে পারে—তা নির্ধারণ করাই এখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মনিরপেক্ষতার মাত্রা

রাজনীতির অর্থ—জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে সুবিন্যস্ত করতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেই নির্দেশনা মোতাবেক জনগণকে ধাবিত করা। জনগণের স্বার্থ ও চিন্তাধারা তাই রাজনীতিকে বরাবরই প্রভাবিত করে এসেছে। ইউরোপ তার সমাজব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে, যেখানে ধর্ম ও রাজনীতির ইতিবাচক সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সৃজনশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। আর এক্ষেত্রে তারা দুটো কৌশলকে বেছে নিয়েছে। প্রথমটি ধর্মীয় সংস্কার এবং দ্বিতীয়টি ধর্মনিরপেক্ষতা। সংস্কারের নামে তারা ব্যক্তিকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষকে ক্যাথলিক চার্চের নিপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য ইউরোপকে মোকাবিলা করতে হয়েছে অনেক ঝড়-ঝাপটার। আর ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে ইউরোপিয়ানরা রাষ্ট্রকে মুক্ত করেছে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর শৃঙ্খল থেকে। ইউরোপিয়ানরা নিশ্চিত করেছে—জনস্বার্থবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে নয়; বরং যুক্তি ও বিবেচনাবোধের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা যায়।

এত কিছুর পরও মানুষের ওপর ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষণীয়। জনস্বার্থবিষয়ক নীতিমালা এবং জনজীবনে এখনও ধর্মের বিস্তর প্রভাব দৃশ্যমান। কারণ, যৌক্তিকতা বা বিবেচনাবোধ সব সময় জনজীবন ও সামাজিক যোগাযোগের কিছু উপলব্ধি থেকে সৃষ্টি। কিন্তু কোনটা ভালো বা মন্দ, কোন বিষয়টা সহনীয় বা অসহনীয়—এই বিষয়গুলো এখনও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

আমাদের এটাও অনুধাবন করতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার অনেকগুলো অবয়ব বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতার আদি উদ্দেশ্য ছিল—রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দূরত্ব তৈরি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মাধ্যমে ইতোমধ্যে সেই দূরত্ব তৈরি করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে খোদাকেই, নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে নীতি ও নৈতিকতাকে। বিংশ শতকের পশ্চিমা সমাজ সেই বাস্তবতাই তুলে ধরেছে। আর একবিংশ শতকের পশ্চিমা সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখানে মানুষের মনুষ্যত্বকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। উত্তর আধুনিক সময়ে এসে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার যে চেহারা এখন দেখছি, তার ভিত্তি—ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তি প্রণোদনা আর সীমার মাত্রাতিরিক্ত লঙ্ঘন।

ধর্মনিরপেক্ষতার উৎস যেখানে

ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ এমন কিছু জটিল, বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে—যাকে খুব সরল সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। হয়তো আধুনিকপূর্ব যুগের ধর্মনিরপেক্ষতার চেহারার সাথে বর্তমান সময়ের ধর্মনিরপেক্ষতার কিছু মিল পাওয়া যাবে। তবে প্রকৃত বাস্তবতা হলো—আধুনিক সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার যে অবয়ব আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সূচনা হয়েছে আধুনিক পশ্চিমা জগতে। আর এটি ক্রমান্বয়ে আরও অনেক দেশে ও সমাজেই ছড়িয়ে পড়েছে।

মৌলিকত্বের জায়গা থেকে চিন্তা করলে ধর্মনিরপেক্ষতা অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। এর মূল বক্তব্য—রাষ্ট্র কখনোই বিশেষ একটি ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস বা মূল্যবোধকে সমুন্নত করার চেষ্টা করবে না কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে দমিয়ে রাখার জন্যও ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করবে না। রাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তা বা ক্ষমতাধর ব্যক্তি যেন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করে সংকীর্ণ ধর্মীয় চিন্তাধারাকে বৃহৎ কোনো সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে, তা-ও নিশ্চিয়তা প্রদান। সেইসঙ্গে তারা যাতে ধর্মীয় কোনো প্রতীক ব্যবহার করে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভেতরে সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব না করতে পারে, সেই ব্যাপারেও সতর্ক থাকা।

এ ধরনের পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে এনলাইটমেন্ট যুগের বোদ্ধারা অনেকগুলো ধারণা ও নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং তারই আলোকে আধুনিক ইউরোপিয়ান মনন ও মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এসব বুদ্ধিজীবী ও চিন্তকরা সাম্য, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা, আইনের উচ্চতম অবস্থানের পক্ষে প্রচারণায় নামেন। এই ধরনের সুচিন্তিত কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ধর্মের উপযোগিতারও ব্যাপক সংস্কার সাধন হয়। ফলে সনাতন ইউরোপীয় আদর্শিক চিন্তার চূড়ান্ত পতন ঘটে।

প্রাথমিকভাবে ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ ধারণার প্রবর্তকরা যে ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক নৈতিকতার আওয়াজ তুলেছিলেন, তার প্রেরণা পেয়েছিলেন ১৫ শতকের মধ্য ইউরোপের বেশ কিছু ধর্মীয় সংস্কারকদের কাছ থেকে। যদিও বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তির জায়গা থেকে তাদের মধ্যে ভিন্নতাও ছিল। প্রথমদিকে যারা রাষ্ট্রকে চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন; বিশেষ করে ডেকার্তে, হোবস, লকি এবং রুশো—তাদের কারও মধ্যেই ধর্মকে বা ঐশ্বরিক চেতনাকে অবনমিত করার কোনো খায়েশ ছিল না; বরং ধর্ম ও ঈশ্বরের অবস্থানকে সমুন্নত রেখেই সংস্কারমূলক চিন্তাধারা প্রচার করেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, ডেকার্ত বলেছিলেন—

> 'জ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং সত্যতা নির্ভর করে আমি সত্যিকারের খোদার প্রতি কতটা সচেতন, তার ওপর। খোদাকে ভালোভাবে না চিনলে আমি কখনোই প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাব না।'[১]

ঠিক একইভাবে রুশোকেও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকভাবে যেমনটি করে ধর্মকে ধারণ এবং চর্চা করা হতো, রুশো ছিলেন সব সময়ই তার কট্টর সমালোচক। তিনি মনে করতেন, আধুনিক রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করাতে ধর্মীয় দায়বদ্ধতা এবং বিশ্বাসকেও ভিন্নভাবে প্রয়োগ করা উচিত। আর সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি নাগরিক পর্যায়ে ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশ কিছু মতবাদ সংযুক্ত করার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করেন।

> 'একটি স্থায়ী, বুদ্ধিদীপ্ত ও কল্যাণমুখী ঐশ্বরিক চেতনার প্রয়োজন আছে—যা সবকিছুকেই পর্যবেক্ষণ এবং সব ইস্যুতেই বক্তব্য প্রদান করবে। কীভাবে জীবনটা এই পর্যায়ে এলো কিংবা জীবনকে সামনের দিনগুলোতে কীভাবে পরিচালনা করা যাবে, ভালো কাজ করলে স্বস্তি কী কিংবা মন্দ কাজ করলে কী শাস্তি মিলবে, সামাজিক সম্পর্ক কীভাবে পরিচালিত হবে অথবা কীভাবে আইন প্রয়োগ করা হবে—এই সকল বিষয়েই উক্ত ঐশ্বরিক চেতনার সুস্পষ্ট অবস্থান থাকতে হবে। আর এগুলোই হলো ইতিবাচক মতবাদ। আর নেতিবাচক চিন্তাধারা বলতে আমি একটি কথাই বলতে চাই—কোনোভাবেই অসহিষ্ণুতাকে সহ্য করা যাবে না।'[২]

এমনকী কান্ট; যিনি একমাত্র গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কোনো তথ্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং নৈতিকতাকে যিনি যৌক্তিকতার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন, তিনি নিজেও বলেছেন—

> 'নৈতিকতাকে সাধারণভাবে ইতিবাচক মনে করা হলেও একজন ঈশ্বর এবং একটি অদৃশ্য জগতের অস্তিত্ব ছাড়া নৈতিকতাকে কখনোই কাজে বা উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয় না।'[৩]

এত কিছুর পরও সত্যকে অগ্রাহ্য এবং ওহির মাধ্যমে আসা জ্ঞানকে বারবার হেয় করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের পরবর্তী প্রবক্তাগণ অত্যন্ত সফলভাবেই ধর্মকে কোণঠাসা করতে এবং নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে সক্ষম হয়।

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা নৈতিকতাকে বরাবরই উপযোগিতার আঙ্গিক থেকে বিবেচনা করে। তারা সত্যকে গ্রহণ করার পরিবর্তে সব সময় লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে। তারা সচেতনভাবে ধর্মকে অসাড় ও অকার্যকর প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে, শুরু হয় আত্মঅহংকার এবং যৌক্তিকতার প্রসার।

এটা সত্য, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে এমন অনেক বুদ্ধিজীবীও আছেন, যারা ধর্মকে মোটেও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। বিশেষ করে ফরাসি সমাজে এই ধরনের ধর্মবিরোধী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তবে তাদের চিন্তাধারা কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপিয়ানদের চিন্তাধারাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। যদিও ফরাসি বিপ্লবের মূল চেতনা ছিল অনেকটা ধর্মবিরোধী, তবে পরবর্তী সময়ে নিটশে'র বর্ণনায় জানা যায়— ধর্মবিরোধিতা বলতে তৎকালীন ফ্রান্সে সংঘবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা বিশেষ করে ক্যাথোলিক চার্চগুলোর বিরোধিতাই করাকে বোঝানো হয়েছিল। আধুনিক দর্শনের আওতায় ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নিটশে আরও বলেন—

> 'প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সেই সময়কার ভূমিকাকে খ্রিষ্টানবিরোধী বলা গেলেও কোনোভাবেই ধর্মবিরোধী বলার সুযোগ নেই।'[৪]

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দাবি করা যায়—ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রকৃত সূচনা ঘটেছিল ধর্মীয় সংস্কারের বার্তা দিয়ে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে—ধর্মীয় উত্তরাধিকার এবং এককেন্দ্রিক ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্টরা যে বিদ্রোহ করেছিল, সেখান থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম। ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভবের সময় সমাজ থেকে ধর্মকে উচ্ছেদ কিংবা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার কোনো ইচ্ছা সেখানে ছিল না; বরং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মূল প্রস্তাবনা ছিল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে আলাদা রাখা।

প্রাথমিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের চিন্তাধারা এমনটা হলেও শতাব্দীকাল পরই ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের সুর পালটাতে থাকে। তারা ধর্মকে একটি নেতিবাচক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেন। তারা দাবি করেন, প্রগতি ও উন্নতির জন্য ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার কোনো বিকল্প নেই।

এই ধরনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কার্ল মার্কস ছিলেন অন্যতম। তিনি দাবি করেন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ধর্মকে সব সময়ই নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখতে হবে এবং লোকালয় থেকে ধর্মকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে।

কিন্তু নির্বাসনে পাঠানো হলেও তিনি ধর্মীয় জীবন থেকে বরাবরই বিপদের আশঙ্কা করতেন। কেননা, তিনি মনে করতেন—ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসে। আর ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অনুশীলন থাকলে সেখান থেকেও সুশীল সমাজের কাঠামোগুলো কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে প্রভাবিত হবে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মকে একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক করার পরও এখনও ধর্মের কারণে সেখানকার সমাজগুলো নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ফলে সেখানে অভ্যন্তরীণ সংহতি হয়ে পড়ছে প্রশ্নবিদ্ধ এবং আর্থিক খাতও নানা ধরনের সংকটে পতিত হচ্ছে। মার্কসের মতে, ধর্মকে সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি নিজেদের মতো করে ব্যবহার করে। ফলে সামাজিক বৈষম্য ও দুরবস্থা আরও ঘনীভূত হয়। বিখ্যাত 'জিউইশ কোশ্চেনে' মানবতাকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রসঙ্গে মার্কস বলেন—

> 'সমাজে ইহুদি ও সাধারণ নাগরিক, প্রোটেস্ট্যান্ট ও সাধারণ নাগরিক, ধার্মিক মানুষ ও সাধারণ নাগরিক হিসেবে যে পচনগুলো রচিত হয়, তার মাধ্যমে নাগরিকত্বের প্রকৃত ধারণাটি একধরনের প্রতারণার মধ্যে পড়ে—এমনটা কিন্তু নয়। আবার এমনও নয়, কোনো কোনো মহল রাজনৈতিক মুক্তির নামেও কোনো ছলনা করছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টাই এমন। এটাই হলো একজন ব্যক্তিকে ধর্মীয় শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রকৃত রাজনৈতিক কৌশল।
>
> যখন একটি সুশীল সমাজের ভেতর থেকে অত্যন্ত উগ্রভাবে একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং রাজনৈতিক মুক্তির ভেতরেই জনগণ তার নিজস্ব মুক্তির স্বাদকে খুঁজে পায়, তখন জনগণের স্বার্থে সেই রাষ্ট্রটিকে অবশ্যই ধর্মকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার পথে অগ্রসর হতে হবে। ঠিক যেভাবে ব্যক্তি-বিশেষের সম্পদকে ধ্বংস বা বিলুপ্ত করা হয় কিংবা যেভাবে রাষ্ট্র জোর করে নাগরিকদের থেকে কর আদায় করে, ঠিক সেভাবেই ধর্ম পালনের দায়ে জীবনটাকেও গ্যালোটিনের মুখে নিক্ষেপ করতে হবে।'[৫]

কার্ল মার্কসের মতো নিটশেও ধর্মকে একটি নেতিবাচক সামাজিক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ধারণা করেন, ধর্মের কারণেই সমাজে দুর্বল ও বঞ্চিত শ্রেণি টিকে থাকে। তাই সার্বিকভাবে গোটা মানবতাও নাজুক অবস্থায় যায়।[৬]

তবে কার্ল মার্কস যেভাবে ধর্মকে সর্বজনীন সমতার অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন, নিটশে তা করেননি। তিনি ধর্মকে খুব গড়পড়তায় খারিজ করে দিয়েছেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে খ্রিষ্টধর্মের সংস্কার সাধন করতে চেয়েছেন। খ্রিষ্টান ধর্মের অগণতান্ত্রিক চেতনা এবং সামাজিক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তার মতে, সামাজিক পদমর্যাদার এই বিষয়টি মানবতা এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক জীবন—উভয়ের জন্যই অপরিহার্য।[৭]

মুসলিম সমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্রের অবস্থান

বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করছেন। তারা মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ইসলামি আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। ইসলামের আইনের ভিত্তিতেই সেখানে সাংবিধানিক আইন সূচিত হয়। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে রাষ্ট্রের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইসলামের একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে এই ধরনের আলোচনার কারণে ইসলামি রাষ্ট্রের গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা সন্দেহের। আর এসব কারণেই আধুনিক সময়ের চিন্তাবিদরা আশঙ্কা করেন—রাষ্ট্র গঠনে ইসলামকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে কট্টরপন্থি ধর্মীয় শাসনেরও উত্থান হতে পারে।

এই ধরনের সংশয় বা সন্দেহ কেবল বহিরাগত পর্যবেক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। পাশাপাশি, যারা ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণের কথা বলেন, তারাও এই ধরনের সংশয়ের শিকার হন। সেইসঙ্গে একটি জনপ্রিয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা কৌশলের সাথে ইসলামি আইনের যোগসূত্র স্থাপন করতে গিয়েও নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়।

আমার মতে—এই সন্দেহটা তখনই তৈরি হয়, যখন আমরা উম্মাহর রাজনৈতিক কাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোকে একই রকম বানানোর চেষ্টা করি। শুধু জটিল কাজগুলোতে বা উন্নতমানের গবেষণাপত্রেই এ ধরনের সন্দেহ-সংশয় দেখা যায়—বিষয়টা তা নয়। সমসাময়িক অনেক ইসলামি চিন্তাবিদের রচনাবলিতেও এই ধরনের সংশয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'নাজারিয়াত আল ইসলাম ওয়া হাদইহি' গ্রন্থে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রের দুই ধরনের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। একদিকে এর উদ্দেশ্য—সব ধরনের আগ্রাসন প্রতিহত, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত এবং রাষ্ট্রের অখণ্ডতাকে সুরক্ষা করা।[৮]

আরেক উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে, কুরআনে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—এমন সব ধরনের বিষয়াবলিকে নিষিদ্ধ করা।[৯] মাওলানা মওদূদী (রহ.) শরিয়াহর সামগ্রিক উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> 'নিঃসন্দেহে এ রকম একটি রাষ্ট্রের জন্য তার কর্ম-কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট বা সীমিত করা বেশ কঠিন। কেননা, সামগ্রিক অর্থে রাষ্ট্র মানুষের জীবনের প্রতিটি ধাপ এবং ঘটনাবলিকেই নানা ধরনের নীতি-নৈতিকতা এবং সংস্কারমূলক কর্ম-কৌশলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। সেই কারণে কোনো ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অথবা কোনো কাজকে একান্ত ব্যক্তিগত কাজ বলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার সুযোগ নেই। কেননা, রাষ্ট্র তার প্রয়োজনে যেকোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। রাষ্ট্রের এই কঠোর চরিত্রের কারণে যেকোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই সমাজতান্ত্রিক কিংবা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে দেখার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও বাস্তব—বর্তমান সময়ে আমরা যে কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রীয় আচরণ দেখতে পাচ্ছি, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তার থেকে অনেকটাই মুক্ত। কারণ, ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় না এবং একই সঙ্গে এখানে স্বৈরশাসন কিংবা এক ব্যক্তির আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্রণকেও বরদাস্ত করা হয় না।'[১০]

আমরা যেই সন্দেহ-সংশয়ের কথা বলেছি, উপরিউক্ত প্যারাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, একবার লেখক ইসলামি রাষ্ট্রকে আধিপত্যবাদী চরিত্রের আদলে সংজ্ঞায়িত করেছেন, কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট শাসনের সাথেও মিল খুঁজে পেয়েছেন। বলেছেন—যে কেউ চাইলেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারবে না। আবার পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের বয়ানের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে গিয়ে দাবি করেছেন—ইসলামি রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় না।

নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদী চরিত্রের যে কথাটি এখানে এসেছে, তার পেছনে মূল কারণ—রাষ্ট্রের কার্যক্রমকে শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতে পর্যালোচনা, উম্মাহর কর্মকাণ্ডকেও ধর্মের নৈতিক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এ দুটি বিষয়কে আলাদা রাখাটা খুবই জরুরি। কেননা, এগুলোকে আলাদা রাখতে পারলেই রাষ্ট্রকে সংযত রাখা যাবে।

তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আইনের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নাগরিকদের ওপর অযাচিতভাবে কোনো সিদ্ধান্তকে চাপিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের বুঝতে হবে, ইসলামি রাষ্ট্র শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করবে না; বরং ইসলামি রাষ্ট্র এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তি-ই হলো বিশ্বজনীন নীতিমালা। আর ইসলামি রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নির্বিশেষে সকলের শান্তি, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

পরবর্তী সময়ে আমরা যে বিষয়টি পরিষ্কার করব তা হলো—ইসলামি ব্যবস্থা কখনোই সমাজের ওপরে কোনো সংকীর্ণ চিন্তাধারা বা ধারণাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি এবং আগামীতেও করবে না। এর কারণ, উম্মাহর ধারণা যখন থেকেই জন্ম নিয়েছে, তখন থেকেই ধর্মীয় নীতিমালাগুলো ইসলামি রাজনীতির মূল নীতিমালা হিসেবে বিবেচিত। মক্কা ও মদিনায় পবিত্র কুরআনের যেসব সূরা নাজিল হয়েছে, তার প্রতিটিতেই মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে যদিও ধর্মীয় দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার অনুশীলনের বিষয়ে ইসলামিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে নানা ধরনের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। মূল ধারার ইসলামি দলগুলো ক্রমাগতভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রবর্তিত ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গেছে। মিশর, জর্ডান, পাকিস্তান, তুরস্ক, সিরিয়া এবং তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলনের যেসব নেতৃবৃন্দ পরবর্তী সময়ে এসেছেন, তারা প্রকাশ্যেই একটি গণতান্ত্রিক এবং বহুমতবিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন—যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা ও চলাচলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।[১১]

আধুনিক রাষ্ট্রের গঠনমূলক নীতিমালা

এই সময়ের চিন্তাবিদরা ইসলামি রাষ্ট্রের যে ধারণা দিয়েছেন, তা নিয়ে সামান্য আলোকপাত করেছি। তাতে দেখা যাচ্ছে—ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণায় একদিকে আধুনিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী কাঠামোকে যেভাবে ধারণ করা হয়েছে, অপরদিকে আবার শরিয়াহর গোষ্ঠীগত কাঠামোকেও ধারণ করা হয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে সার্বিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তা রাসূল ﷺ প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা থেকে অনেকটাই আলাদা।

পরবর্তী সময়ের মুসলমানরা বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে ধারাবাহিকভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণায়ও নানা পরিবর্তন এনেছেন। প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্রের মূল নীতিমালাগুলোর দিকে তাকালে, প্রাথমিক যুগের ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণার সাথে আজকের সময়ের ধারণার অমিলগুলো দিবালোকের মতো পরিষ্কার হবে। মূলত প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের নীতিমালা ও কাঠামোর ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে মদিনা সনদে। এই মদিনা সনদই রাসূল ﷺ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক ভিত্তি।[১২]

মদিনা সনদে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নীতিমালার প্রণয়ন করা হয়েছিল—যার ওপর ভিত্তি করে প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংবিধানও প্রণীত হয়। একই সঙ্গে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যদের দায়িত্ব এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলো নির্ধারণ করা হয়েছিল। মুসলিম ও অমুসলিম; সকল নাগরিকদের সমন্বয়ে ক্রমবর্ধমান একটি সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোকে নির্মাণ করা হয়েছিল। মদিনা সনদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিমালাগুলো ছিল—

১. এই সনদে বলা হয়েছিল, উম্মাহ একটি রাজনৈতিক কাঠামো, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি উম্মাহর নির্ধারিত নীতিমালা ও মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। একই সঙ্গে উম্মাহর যে দায় ও দায়িত্ববোধ রয়েছে, সেগুলোকেও বহন করতে প্রস্তুত থাকবে। এই উম্মাহ কোনো বিশেষায়িত কাঠামো নয়, যেখানে অধিকার ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলো শুধু নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্যই প্রযোজ্য থাকে। উম্মাহর সদস্য হতে হলে যে যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে—

    ক. ইসলামি আইন ও নৈতিকতার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া।

    খ. ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে কার্যত যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়, সেগুলোর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করা।

মদিনা সনদের একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদে আনুগত্য, বিশ্বস্ততা এবং জনকল্যাণকে উম্মাহর সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান নীতিমালা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সনদের শুরুতেই বলা হয়, এই সনদ নবি মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক প্রণীত হচ্ছে। সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ এই সনদকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ ও আনুগত্য এবং এর আলোকে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে।[১৩]

২. এই সনদ একটি সাধারণ কাঠামো প্রণয়ন করবে—যা নতুন এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির আচরণ এবং তার রাজনৈতিক কার্যক্রমের সীমানাকে নির্ধারণ করে দেবে। একই সঙ্গে এই সনদ গোত্রপ্রথা নির্ভর আরব্য সমাজব্যবস্থার মূল সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকেও সংরক্ষণ করবে। তবে গোত্রগত চেতনা এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যকার বিদ্যমান অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। এই সনদ আরও ঘোষণা করছে—মক্কা থেকে আসা মুহাজির এবং মদিনায় বসবাসরত বানু আল হারিস, বানু আল আওস এবং অন্যান্য গোত্র বিদ্যমান প্রথা অনুযায়ী তাদের যাবতীয় কর এবং অন্যান্য পাওনাদি আগের মতোই পরিশোধ করবে। পাশাপাশি, প্রতিটি গোত্র তাদের হাতে থাকা বন্দিদেরও মুক্ত করে দেবে।[১৪]

সেই সময় ইসলাম কেন গোত্রপ্রথাকে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত করেনি, তার অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা কারণগুলোকে নিম্নোক্ত তিনটি প্যারায় উল্লেখ করার চেষ্টা কর—

ক. প্রথমত গোত্রগুলোর মধ্যে বিভেদ-বিভাজন শুধু রাজনীতির কারণে নয়; বরং সামাজিক ভিন্নতার কারণেও সৃষ্ট হয়েছিল। তৎকালীন সময়ের প্রতিটি গোত্রের নিজ নিজ প্রথা এবং প্রতিনিধিত্বশীল নিদর্শনও ছিল। তাই বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে যদি গোত্রগুলোর ভিন্নতাকে হুট বিলুপ্ত করে দেওয়া হতো, তাহলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হতো। আর গোত্রগুলোর সদস্যরাও হতো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

খ. সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও গোত্রগুলোর মাঝে ব্যাপক অর্থনৈতিক পার্থক্য ছিল। ইসলামপূর্ব এবং পরবর্তী আরবে মেষ পালন ও পশুচারণকেই প্রধান অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হতো। এই খাত থেকে যা আয় আসত, তাতেও ছিল ভিন্নতা। ফলে আয়ের ওপর ভিত্তি করেই গোত্রগুলোর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হতো। অর্থনৈতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য সৃষ্টি হতো মূলত চলাচলের সীমাবদ্ধতা এবং অভিবাসন সংকটের কারণে। উৎপাদনকৃত পরিমাণের ভিন্নতাকে বিবেচনায় না নিয়েই সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় হুট করে কোনো পরিবর্তন আনা হলে তা অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলাত।

গ. গোত্রপ্রথাকে জিইয়ে রাখার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কারণ—আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে আগাগোড়াই এক ধরনের আগ্রাসন এবং আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অস্তিত্ব ছিল। অন্যের কর্তৃত্ব থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে গোত্রগুলো এই ধরনের মানসিকতা চর্চা করত। এই বাস্তবতার আলোকে, বিকল্প গঠনমূলক সামাজিক বা রাজনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত কিংবা কেন্দ্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা চলে আসার আগেই গোত্রপ্রথাকে বিলুপ্ত হলে, গোত্রের সদস্যদের আগ্রাসী মনোভাবের কারণে গোটা অঞ্চলে মারাত্মক ধরনের উত্তেজনা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এই সব বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে ইসলাম একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রণয়ন করে, যার ভিত্তি ছিল উম্মাহর সর্বজনীন ধারণা। বিভাজনকেন্দ্রিক গোত্রপ্রথার বিরুদ্ধে এই 'উম্মাহ' ছিল একটি গঠনমূলক বিকল্প ব্যবস্থা। উম্মাহর ধারণা চলে আসায়, গোত্রপ্রথার অস্তিত্ব থাকলেও তাদের অন্তর্নিহিত আগ্রাসী উপাদানগুলো অনেকটাই হ্রাস পায়। যদিও রাসূল ﷺ-এর ওপর যে ওহিগুলো নাজিল হতো, তার দাবি ছিল অনতিবিলম্বে গোত্রপ্রথাকে বিলুপ্ত করে দেওয়া। ইসলাম সব সময়ই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ এবং সেই সূত্রে এই ধরনের গোত্রপ্রথার সমালোচনা করে। কিন্তু তারপরও সার্বিক বিবেচনায় মদিনা সনদে নয়া ইসলামিক রাষ্ট্রে গোত্রপ্রথা বিলুপ্তির ব্যাপারে ধীরে চলো নীতিকে অনুসরণ করা হয়। রাজনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনার বিষয়টিকেও অর্থনীতি আর উৎপাদন কাঠামোর ধারাবাহিক উন্নতির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।[১৫]

৩. সমাজের সকল সদস্যের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চায় বলেই ইসলামিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ধর্মীয় সহনশীলতাকেই প্রধান নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণেই মদিনা সনদে ইহুদিদের নিজ নিজ ধর্মীয় নীতিমালা অনুসরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সনদে বলা হয়—'বনু আওফের মানুষগুলো ঈমানদারদের সাথেই সহাবস্থান করবে। এক্ষেত্রে ইহুদিরা নিজেদের ধর্ম পালন করবে, আর মুসলমানরা তাদের।'

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদে বরাবরই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যকার সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া বিদেশি শক্তির আগ্রাসন থেকে মদিনাকে মুক্ত করার জন্যও এই ধরনের

সহযোগিতামূলক সম্পর্কের কোনো বিকল্প ছিল না। ইহুদিরা নিজেদের ব্যয় মেটাবে আর মুসলমানরা তাদের। বাইরের কেউ যদি চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে, তাহলে মুসলমান ও ইহুদিরা একসঙ্গে সেই বহিঃশক্তিকে মোকাবিলা করবে। তারা যেকোনো পরিস্থিতিতে পরস্পরের সহযোগিতা ও পরামর্শও গ্রহণ করবে।

মদিনা সনদে মুসলমানদের সব ধরনের জুলুম করার রাস্তা বন্ধ করা হয়। মুসলমানরা যাতে কোনোভাবেই ইহুদিদের প্রতি অবিচার করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা হয়। এর আগে ইহুদিদের হাতে যেসব মুসলমানরা নিগৃহীত হয়েছে, তাদের সেই বঞ্চনার প্রতিশোধ যেন মদিনার ইহুদিদের ওপর না নেওয়া হয়—তা-ও এই চুক্তিতে নিশ্চিত করা ছিল। বলা হয়—'যতক্ষণ ইহুদিরা এই চুক্তির প্রতি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকবে, সমাজে সাম্য ও শান্তি বজায় রাখবে, তাকে সম্মান প্রদান করা হবে এবং কোনোমতেই চুক্তিতে আবদ্ধ অপর সম্প্রদায়গুলো সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির শত্রুকে সহযোগিতা করতে পারবে না।'[১৬]

৪. এই সনদে এমন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে, যা সর্বজনীন মূল্যবোধ ও নীতিমালা বজায় রাখবে। সেখানে সকল মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজের সার্বভৌমত্ব শুধু নীতিনির্ধারক কিংবা নির্দিষ্ট কোনো দল সংগঠন বা সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং সার্বভৌমত্ব দিয়েই সমাজে ন্যায়বিচার ও সততাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মাধ্যমেই সকলের মর্যাদা ও সম্মানকে নিশ্চিত করা হয়।

এই মদিনা সনদে বারবার ন্যায়বিচার, সততা ও ইতিবাচকতাকে সমুন্নত করা হয়েছে এবং নানাভাবে অন্যায়, অবিচার ও জুলুমকে করা হয়েছে প্রত্যাখ্যান। সনদে আরও বলা হয়েছে—'তারা অবশ্যই তাদের বন্দিদের সাথে সহানুভূতি এবং ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করবে। কেননা, এটাই ঈমানদারদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।' আরও বলা হয়েছে—'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী বান্দারা সব ধরনের জুলুম, হঠকারিতা, অবিচার, শত্রুতা, পাপ এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকবে। এমনকী যদি তাদের নিজেদের সন্তান বা নিজের সম্প্রদায়ের কেউ এই ধরনের কোনো অপরাধে সম্পৃক্ত হয়, তাহলেও তারা বলিষ্ঠভাবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।[১৭]

৫. এই সনদে মদিনা নামক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা মানুষগুলোর অনেকগুলো রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে—

ক. মজলুমকে সাহায্য করা।

খ. সংঘবদ্ধ অপরাধকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করা। কেননা, ইসলামপূর্ব আরবে এই ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধের প্রবণতা ছিল অনেক বেশি। শুধু তা-ই নয়; ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের অন্যায়ের দায় থেকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

গ. বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। অর্থাৎ ইহুদিদের নিজস্ব ধর্ম আছে এবং তা পালনেরও অধিকার রয়েছে। ঠিক তেমনই মুসলমানদেরও নিজস্ব ধর্ম রয়েছে।

ঘ. নাগরিকদের চলাচল ও যাতায়াতের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদিনা ছেড়ে যাবে, সে নিরাপত্তা পাবে। যে মদিনায় অবস্থান করবে, সে-ও নিরাপত্তা পাবে। শুধু যারা অপরের সাথে অন্যায় আচরণ করবে, তারা এই নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধা পাবে না।[১৮]

ঐতিহাসিক মুসলিম সমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্বরূপ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ওহি বা ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসারে মুসলিম উম্মাহ বরাবরই একই সঙ্গে বহু ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতার চেতনাকে ধারণ করেছে। খোলাফায়ে রাশেদার পরে যে মুসলিম সরকারগুলো এসেছিল, তাঁরাও ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছিল। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, মুসলিম শাসকরা সংখ্যালঘু অমুসলমানদের শুধু ধর্মীয় আচারাদি পালন করার সুযোগ দিয়েছিল তা-ই নয়; বরং অমুসলিম অধ্যুষিত স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক কাঠামোতে নিজেদের ধর্মীয় আইন বাস্তবায়ন করারও সুযোগ দিয়েছিল।

সেই একই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহ বরাবরই বিভিন্ন মতবাদের প্রয়োগ, প্রণয়ন ও প্রচারণায় এবং এই মতবাদগুলোর তাত্ত্বিক ও আইনি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্মান করে। উম্মাহ কখনোই প্রত্যাশা করে না, রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে কিংবা একটি

সম্প্রদায়কে অপর একটি সম্প্রদায়ের ওপরে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেবে। পাশাপাশি, উম্মাহর সর্বজনীন চেতনা কখনোই রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ক্ষমতাকেও অনুমোদন দেয় না।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো সময় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে অপরের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করা হয়নি। এ জাতীয় যেই দুই-একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, সেগুলো নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। উদাহরণস্বরূপ, আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে সকলকে মুতাজিলা দর্শন ধারণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে যাবতীয় বিতর্ক বা প্রশ্ন উত্থাপনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ আলিমরা খলিফা মামুনের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেননি। খলিফা মামুন যেভাবে জুলুম ও শক্তি প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা উম্মাহর সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করেছে। উম্মাহর সর্বজনীন চেতনায় কখনো তরবারি দিয়ে কোনো দার্শনিক বা ধর্মীয় ইস্যুকে সমাধান করার কথা বলা হয়নি। ইতিহাসে দেখা যায়, খলিফা আল মামুনের তিন প্রজন্ম পরেই ক্ষমতায় আসেন আল ওয়াসিক বিল্লাহ নামক একজন খলিফা। তিনি তার পূর্বসূরি আল মামুনের এই ধরনের নিপীড়নমূলক সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন।

নিঃসন্দেহে মুসলমানদের কাছে একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন পরিস্থিতি তৈরি করা—যাতে মানুষ খলিফা হিসেবে নিজেদের দায়িত্বগুলোকে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা কখনোই ইসলামের শিক্ষাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়নি। এ কারণে যে সমস্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মুসলিম উম্মাহকে কোনো একটি সংকীর্ণ চিন্তাধারার মধ্যে আটকে রাখতে চায় কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণকে কিছু নির্দিষ্ট আইন মানতে বাধ্য করতে চায়, সেগুলো মূলত ব্যক্তির ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্যে কিছু সংশয় তৈরি করে।

উম্মাহর চেতনার মূল উদ্দেশ্য হলো—এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে ব্যক্তির সব ধরনের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি নিশ্চিত হয় এবং আইনের নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে একজন নাগরিক তার সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে—যাতে উম্মাহর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

একই সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মানবিক যাবতীয় সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে সব ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটকে কাটিয়ে উঠা এবং সর্বোপরি উম্মতের নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

আমরা যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের হাতিয়ার হওয়া থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে শরিয়াহর সাধারণ ও বিশেষায়িত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং উম্মাহ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে বিভাজন তৈরি করাটা অনেক বেশি প্রয়োজন। সেইসঙ্গে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক প্রগতির চর্চাকারীদের গ্রেফতার করবে না। কোনো ধরনের আধ্যাত্মিক, তাত্ত্বিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করবে না।

সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন বজায়

ঐতিহাসিকভাবেই দেখা যায়, মুসলিম সমাজের আইনি কার্যক্রমগুলো কেবল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অধিকন্তু আইনের একটি সর্বব্যাপী ও বিস্তৃত চর্চা ছিল—যা নৈতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল। যেহেতু অধিকাংশ আইন-ই ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারিক লেনদেন, বিনিময় ও আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো, তাই বিচারিক কার্যক্রমটাও স্বাভাবিকভাবেই উম্মতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তবে রাষ্ট্রের সাথে সেই অর্থে বিচার প্রক্রিয়ার খুব একটা সম্পৃক্ত হয় না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কেবল তখনই নিরূপণ সম্ভব, যদি এ সংক্রান্ত আইনগুলোকেও আলাদা রাখা যায়।

কেবল ক্ষমতাকে এককেন্দ্রিক হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যই আইনি কাঠামোগুলোকে আলাদা করে রাখতে হবে—বিষয়টা শুধু এমনও নয়। যদিও পশ্চিমা জগতে বর্তমানে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বয়ান দিতে গিয়ে এ জাতীয় ব্যাখ্যাই দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই আইনের কাঠামোগত এই পার্থক্যটা বজায় রাখা দরকার।

ইসলাম সব সময়ই যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আইনগত এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং চেষ্টা করে—যাতে অন্য সম্প্রদায়ের আইনি বিষয়গুলো কোনো সরকারি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের চাপে পিষ্ট না হয়।

অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে। তারা সকল নাগরিককে একটি একক আইনি কাঠামোর আওতায় ফেলার সুপারিশ জানায়। আর এটা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আইন প্রণয়নে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মূল্যবোধ ও নীতিমালাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা নৈতিক স্বায়ত্তশাসনকে নিশ্চিত করতে আইনের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তাকে খুব একটা উপলব্ধি করেননি। কারণ, তখনকার পরিস্থিতিও তেমনটা দাবি করেনি। কিন্তু তারা আগাগোড়াই খুবই মার্জিতভাবে কাজ করে গেছেন, যাতে সকল নাগরিকের মৌলিক এবং মানবাধিকার নিশ্চিত হয়। ইসলামের প্রথম যুগের আইনজ্ঞরা এই মর্মে মত দিয়েছিলেন—যেসব অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করার শর্তে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবে। আর রাষ্ট্রীয় আইন মুসলমানদের মতোই তাদের একই ধরনের নিরাপত্তা দেবে এবং তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে। মুহাম্মাদ ইবনে আল হাসান আল সায়বানি (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন—

> 'যখন কোনো অমুসলমান সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হবে, তারপর থেকে মুসলমানরা অমুসলমানদের আর কোনো বাড়িঘর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। তাদের বসত ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। সেইসঙ্গে যেহেতু এই অমুসলমানরা শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়েছে, সেই কারণে তারাও মুসলমানদের মতোই সম্পদের মালিকানা ও অধিকার উপভোগ করতে পারবে।'[১৯]

প্রথম যুগের মুসলিম আইনজ্ঞরা অমুসলিমদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। অমুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত গ্রাম ও শহরগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল। অমুসলিমদের অধিকারের ওপর সবচেয়ে বড়ো এবং বিখ্যাত গ্রন্থ লিখেছিলেন আল শায়বানি। তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন—'যেসব খ্রিষ্টানরা শান্তিচুক্তিতে সম্মত হয়েছিল, তাদের সব ধরনের ব্যাবসা করার অধিকার ছিল। এমনকী তারা তাদের শহরে মদ ও শূকরেরও ব্যাবসা করতে পারত; যদিও মুসলমানদের জন্য এই ব্যাবসা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।'[২০] তবে চুক্তিতে এটাও উল্লেখ ছিল, এই নিষিদ্ধ ব্যাবসাগুলো খ্রিষ্টানরা নিজেদের গ্রাম ও শহরে করতে পারলেও মুসলমান নিয়ন্ত্রিত শহরে বা গ্রামে এ ধরনের সুযোগ পাবে না।

ইসলামের প্রথম যুগের আইনবিদরা শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের সদস্যদের যেকোনো ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ পদে; এমনকী বিচারপতি বা মন্ত্রী হওয়ারও পথ খোলা রেখেছিল। তবে, যেহেতু বিচারপতিদের সাধারণ আইনের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রথা ও ফতোয়াকেও বিবেচনায় নিয়ে রায় দিতে হয়, তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের বিচারক হিসেবে কাজ করতে পারতেন না। আবার মুসলমান বিচারপতিরাও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মামলা পরিচালনা করতে পারতেন না। নিজস্ব আইন অনুযায়ী অমুসলিমদের বিচার পাওয়ার যে অধিকার, তা নিয়ে কোনো সময়ই খুব একটা মতবিরোধ ছিল না। তবে কোন পদ্ধতিতে বা কী উপায়ে অমুসলিম ম্যাজিস্ট্রেটরা বিচারকার্য সম্পাদন করবেন, সেটা নিয়ে বিতর্ক ছিল।

সাধারণভাবে তৎকালীন সময়ে মুসলিম বিচারপতিদের কাজি বলা হতো। অমুসলিমদের কাজি বলা যাবে কি না—এটা নিয়েও ছিল মতপার্থক্য। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিচারপতির এই আসনটি রাজনৈতিক পদবি হিসেবেও স্বীকৃত ছিল। তাই তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক নেতাদেরই অনেকক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হতো।[২১] এক্ষেত্রে আল মাওয়ার্দি তাঁর বর্ণনায় তৎকালীন সময়ের মন্ত্রিত্বের পদগুলোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী (ওয়াজির তাওহিদ), আর আরেকটি নির্বাহী মন্ত্রী (ওয়াজির তানফিদ)। পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা খলিফার প্রভাবের বাইরে গিয়েও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। তবে নির্বাহী মন্ত্রীদের খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত সীমানার আওতায় থেকেই কাজ করতে হতো।[২২] এ বাস্তবতায় প্রথম যুগের ইসলামি আইনবিদরা নির্বাহী পদে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ সকল গোষ্ঠীর লোকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পক্ষে থাকলেও তাদের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করার ব্যাপারে একমত ছিলেন না।[২৩]

সে যাইহোক, এটা অনস্বীকার্য—প্রাথমিক যুগের শরিয়াহ আইন শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ সকল অমুসলিম নাগরিকের বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছিল। তবে অষ্টম শতকের শুরুতে এসে এই আইনগুলোতে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। মূলত ওই সময়টিতে গোটা মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক গোলযোগ উত্তেজনা বিরাজ করছিল। একদিকে মঙ্গলরা মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়া আক্রমণ করে তছনছ করে দিয়েছিল। ফলে বিগত কয়েক শতাব্দীর যাবতীয় অর্জন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং পতন ঘটেছিল বাগদাদের খিলাফতের। অন্যদিকে, একই সময়ে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার উপকূলে ক্রুসেডাররা নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

আবার পশ্চিমে, স্পেনে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় ধারাবাহিকভাবে কমে আসছিল। ফলে মুসলমান ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের জন্ম নেয়।

সেই অবস্থায় তৎকালীন খলিফা উমর এবং সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের মধ্যে নতুন একটি চুক্তি প্রণীত হয়। যদিও এই চুক্তির নানা ধারা নিয়ে সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে। তবে বাহ্যত এর মূল উদ্দেশ্য ছিল চুক্তিবদ্ধ খ্রিষ্টানদের অবনমিত এবং তাদের জন্য পৃথক পোশাক নির্ধারণ করা। তবে এই চুক্তির খুব একটা প্রভাব পরবর্তী সময় আর লক্ষ করা যায়নি। আব্বাসীয় খিলাফতের পরে মুসলমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী খিলাফত হিসেবে অটোম্যান তথা উসমানীয় খিলাফতের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের প্রথম যুগের মতো আবারও অমুসলিম নাগরিকদের আইনগত ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া শুরু করে।

ইসলাম, সুশীল সমাজ ও রাষ্ট্র

যেকোনো নিপীড়নমূলক শাসনের হাত থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতেই আধুনিক রাষ্ট্র ধারণার উদ্ভব হয়েছিল। সেইসঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাজের সকল সদস্য যেন একইভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, তা নিশ্চিত করাও আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। এটা করতে গিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের প্রবর্তকেরা উপলব্ধি করেন—সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনকী সংঘবদ্ধ ধর্ম কাঠামোকেও নির্বাহী বিভাগের হাত থেকে মুক্ত রাখাটা একান্তভাবে প্রয়োজন। যদিও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদি প্রবক্তাগণের ধর্মীয় ও নৈতিকতাসংক্রান্ত বিষয়গুলোকে উচ্ছন্নে পাঠানোর কোনো নিয়্যাত ছিল না। তারা বরং এগুলোকে নাগরিকদের নৈতিক মানদণ্ড হিসেবেই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সমর্থকরা ধারাবাহিকভাবে একধরনের ধর্মবিরোধী মানসিকতায় উজ্জীবিত হন এবং ক্রমান্বয়ে তারা নৈতিক বিষয়গুলোকে বিসর্জন দেন।

নৈতিকতার ধারাবাহিক বিসর্জন এবং আধুনিক রাজনীতির ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও অপকৌশল সার্বিকভাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই এখন হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। কেননা, এরই মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কতগুলো দুর্নীতিবাজ নেতা, কর্মকর্তা এবং আত্ম-অহংকারী কিছু গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে জিম্মি করে ফেলেছে।

এই পরিস্থিতিতে আবারও ধর্মকে যাপিত জীবনে ফিরিয়ে আনা এবং সংঘবদ্ধ ধর্মীয় কাঠামোগুলোকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করার দাবি জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। মুসলিম সমাজে ইসলামিক মূল্যবোধগুলো ঐতিহাসিকভাবেই ব্যক্তির রাজনৈতিক চিন্তাধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করলেও সম্প্রতি মুসলিম দেশগুলোর তুলনায় বরং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলোতেই ধর্মের অপরিহার্যতা বেশি অনুভূত হচ্ছে। এটা দুঃখজনক, অতীত যুগের ইসলামি পণ্ডিত ও দার্শনিকরা রাষ্ট্রকে ধর্মের সাথে মেলানোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সচেতন থাকলেও বর্তমান সময়ের মুসলিম চিন্তাবিদরা ততটা মুনশিয়ানার পরিচয় দিতে পারেননি।

আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণার সমর্থকরা পরিস্থিতির চাপে পড়ে ধর্মকে রাষ্ট্রের কাঠামোতে নিয়ে আসার যে আগ্রহ দেখিয়েছে, তা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আধুনিক ইসলামিক চিন্তাবিদরা ততটা পরিণত কৌশল অবলম্বন করতে পারেনি। বিশেষ করে আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ইসলাম—উভয়কে একই সঙ্গে ধারণ করে চলার মতো কাঠামো, উদ্দেশ্য নিরূপণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সব ধরনের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে তারা সমানভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি।

এই বাস্তবতায় এখন সময় এসেছে নতুন করে ভাবার। মুসলিম চিন্তাবিদদের নতুন নতুন চিন্তা নিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে হবে, যার লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক নীতিমালা এবং কর্তৃত্বকে নতুনভাবে নির্ধারণ করা। এটা করা গেলে মুসলিম শিক্ষাবিদদের মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে। আরেকটি বিষয়—ইসলামের প্রথম যুগে যে রাজনৈতিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছিল—তা ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে বিবেচনায় নিয়েই। তাই ঐতিহাসিক সেই ইসলামিক মডেলগুলো বর্তমান সময়ের মুসলমানদের জন্য তথ্যের বিরাট ভান্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেকোনো আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের মডেল প্রণয়নেও ঐতিহাসিক ইসলামিক মডেলগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা, প্রাথমিক ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণায় মূলত ইসলামি মূল্যবোধ ও নীতিমালাগুলোকেই ধারণ করা হয়েছিল। আর আধুনিক রাষ্ট্র গঠনেও সেই একই মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, ইসলামের রাজনৈতিক ধারণাগুলো সামাজিক জীবনে নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনতে এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলোকে সংরক্ষণ করতে

ভীষণভাবে সহযোগিতা করবে। একই সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যের যে বক্তব্যকে সামনে নিয়ে এসেছে, তা-ও ইসলামিক রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তিতেই নিশ্চিত করা সম্ভব। ইসলামের রাজনৈতিক ধারণা সফল হওয়ার ব্যাপক সুযোগ আছে। কেননা, ঐতিহাসিকভাবে যে মুসলিম সমাজগুলোকে আমরা জানি, সেখানে একদিকে যেমন শাসকের গতিশীল নেতৃত্ব ছিল, ঠিক একইভাবে সুশীল সমাজের কার্যকর অবস্থানও ছিল দৃশ্যমান।

আজকের সময়ে এসে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র যে নৈতিক নীতিমালাগুলো প্রতিষ্ঠার কথা বলছে, সেগুলোর বাস্তবায়নে অনেক ধরনের নাগরিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন পড়বে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে এই ধরনের নাগরিক প্ল্যাটফর্মগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। মূলত নাগরিকরাই এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। এর বিপরীতে রাষ্ট্র মূলত নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা এবং বিচারপ্রাপ্তির শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে সক্রিয় থাকে। এই বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব। কেননা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময়ই নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কাজ করে।

ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সাম্যের যে প্রশ্ন এখন তোলা হচ্ছে, তা ইসলামের রাজনৈতিক ভাবনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম সব সময় নাগরিকদের এমন কিছু স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলে, যার মাধ্যমে তারা (নাগরিকেরা) তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে। সুশীল সমাজকে যদি রাষ্ট্রের কঠোর হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি ইসলামি শরিয়াহর আওতায় নিয়ে আসা যায়—যেখানে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের নীতি-নৈতিকতা উন্নতকরণে প্রয়োজনমতো আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তাহলে আধুনিক সময়ের রাষ্ট্র ধারণার ভেতরেও একটা সুন্দর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

নাগরিকদের স্বাধীনতা দেওয়া হলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতার বহিঃপ্রকাশ হতে পারে। সেটা হয়তো আটকানো যাবে না, তবে আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেকোনো অবস্থাতেই সমতাকেই ন্যায়বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জনপ্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকতে হবে সকলের সমান সুযোগ। প্রত্যেককে অপরের স্বার্থকে ইতিবাচকভাবে অনুধাবন করতে এবং সর্বোপরি সমাজে বিদ্যমান নানা সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১. Rene Descartes, *Meditations on First Philosophy*, trans. John Cottingham (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986), P. 49.

২. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, trans. Maurice Cranston (London: Penguin Books, 1968), p. 186

৩. Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, trans. Norman Kemp Smith (New York: Macmillan, 1929), p. 640

৪. Friedrich Nietzsche, *Beyond Good and Evil* (New York: Vintage Books, 1966), p. 66

৫. Karl Marx, *The Marx-Engels Reader*, ed. Robert C. Tucker (New York: W. W. Norton, 1978), p. 28

৬. Friedrich Nietzsche, *Beyond Good and Evil* (New York: Vintage Books, 1966), p. 74-75

৭. Friedrich Nietzsche, *Beyond Good and Evil* (New York: Vintage Books, 1966), p. 45

৮. Abul al-Ala al- Mawdudi, *Nazariyat al-Islam wa Hadyihi* (Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Saudiah, 1985), p. 47

৯. Abul al-Ala al- Mawdudi, *Nazariyat al-Islam wa Hadyihi* (Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Saudiah, 1985), p. 22-23

১০. Abul al-Ala al- Mawdudi, *Nazariyat al-Islam wa Hadyihi* (Jeddah, Saudi Arabia: Dar al-Saudiah, 1985), p. 24

১১. Rashid al Ghanoushi, *al-Huriyat al Ammah fi al-Dawlah al-Islamiyyah* [General Liberties in the Islamic State] (Beirut: Markez Dirasat al, *Wahdah al-Arabiyyah*, 1993), p. 258

১২. For the full text of the Covenant of Madinah, See Ibn Hisham, al Sirah al Nabawiyyah [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501-502

১৩. Ibn Hisham, *al Sirah al Nabawiyyah* [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501

১৪. Ibn Hisham, *al Sirah al Nabawiyyah* [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501

১৫. Quran 9:97 & 49:14

১৬. Ibn Hisham, *al Sirah al Nabawiyyah* [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501

১৭. Ibn Hisham, *al Sirah al Nabawiyyah* [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501

১৮. Ibn Hisham, *al Sirah al Nabawiyyah* [*The Biography of the Prophet*] (Damescus: Dar al Kunuz al Adabiyyah) Vol.1. pp. 501

১৯. Muhammad Bin Ahmed, al Sarakshi, Sharh Kitab al Siyaral-Kabir (Pakistan: Nusrullah Mansour, 1405 AH),4:1530

২০. Muhammad Bin Ahmed, al *Sarakshi, Sharh Kitab al Siyaral-Kabir*

২১. Ali ibn Muhammad al Mawardi, *al Ahkam al Sultaniyyah* (Cairo: Dar al Fikr, 1983/1401), p. 59

২২. Ali ibn Muhammad al Mawardi, al *Ahkam al Sultaniyyah*

২৩. Ali ibn Muhammad al Mawardi, al *Ahkam al Sultaniyyah*

২৪. Ibn al Qayyim, *Sharh al Shurut al-Umariyyah* (Beirut: Dar al Ilam li al-Malayin, 1961/1381)

আল মাওয়ার্দির রাজনৈতিক ভাবনা : ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা—সাইয়্যেদ এ. আহসানি

মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা পরাশক্তির আধিপত্য বিস্তারের পর রাজনৈতিক পদ্ধতি নিয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। প্রথমত, যারা আধুনিক চিন্তায় বিশ্বাস করেন, তারা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মডেলটিকে পুরোপুরিভাবে ধারণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে রক্ষণশীলরা মনে করেন, পশ্চিম ধারাকে পুরোপুরিভাবে লালন করতে গেলে ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান ঘটতে পারে। আর সেটা করা কখনোই সমীচীন হবে না। কেননা, ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের মূলনীতিমালার সঙ্গে বরাবরই সাংঘর্ষিক। তৃতীয়ত, আরেকটি ধারাকেও পাওয়া যায়—উদারমনা; তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার পক্ষে থাকছেন। তারা পশ্চিমা ধারণা থেকেও যেমন ইতিবাচক বিষয়গুলোকে নিতে চাইছেন, তেমনিভাবে আবার ইসলামের ঐতিহ্যকেও ধারণ করতে চাইছেন।

এই তিনটি ধারা যে একেবারে নতুন, তা কিন্তু নয়। আব্বাসীয় আমলেও মুতাজিলাদের উত্থান ঘটে। তারা যুক্তিবাদকেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করে। তখনও এ রকম তিনটি ধারার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন মনে করতেন, ওহির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই অকাট্য যুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাই যুক্তির প্রভাবে ওহির মূল চেতনা হুমকির মুখেও পড়তে পারে।

মূলত আল মামুনের সেই আশঙ্কা থেকেই দুটো প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর জন্ম হয়। একটি আহলে হাদিস বা সনাতনপন্থি ধারা—যারা যুক্তিকে পুরোপুরিভাবে অগ্রাহ্য করে। আর আরেকটি আশারাইত, যারা ঐশ্বরিক বাণীকে গ্রহণযোগ্য রাখার উদ্দেশ্যে সীমিত আকারে যুক্তির ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নেয়।

পরবর্তী সময়ে যুক্তিবাদীদের নিষিদ্ধ করার পর মাওয়ার্দির এ বিতর্কটিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আহলে হাদিস বা আশারাইত কিছুই ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন মুক্তমনা চিন্তাবিদ, যিনি যৌক্তিক ধর্মতত্ত্বের চর্চা করতেন। তিনি মনে করতেন, যে বিষয়গুলোতে ওহির সরাসরি কোনো বক্তব্য নেই, সেখানে যুক্তি প্রয়োগের সুযোগ আছে। মাওয়ার্দির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো—পলিটিক্যাল জাস্টিস বা রাজনৈতিক ন্যায়বিচারসংক্রান্ত ধারণার প্রবর্তন। ইসলামি শরিয়াহর আলোকে তিনিই প্রথম এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

মাওয়ার্দি তাঁর *আল আহকাম আল সুলতানিয়া* নামক গ্রন্থে জনসম্পৃক্ত আইনগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন—অনেকেরই মনে হতে পারে, পূর্বের শরিয়াহ বিধান দিয়ে বোধ হয় আদল বা ন্যায়বিচার পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না। ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো—ধর্মানুরাগী মুসলিম শাসকরা শরিয়াহকে ধর্মীয় পর্যবেক্ষণের আলোকে বিবেচনা এবং (তৎকালীন আলিম-উলামাদের পরামর্শ অনুযায়ী এর প্রয়োগ করতেন। ফলে আলিমসমাজ সেই সব শাসকদের অনেক পদক্ষেপেই ছিলেন সন্তুষ্ট। মুসলিম শাসকদের ওপর আলিমগণের প্রবল ভরসা থাকায় তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো খলিফার হাতেই ছেড়ে দিতেন। এভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে ধর্ম হয়ে যায় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে ধর্মীয় ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকাঠামোর সহাবস্থানের যে সুযোগ ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়।[১] সহাবস্থানের এই ধারণাটি রাসূল ﷺ নিজেই সূচনা করেছিলেন। কেননা, তিনি একই সঙ্গে ছিলেন নবি এবং রাষ্ট্রনায়ক।[২]

মদিনার সংবিধান

মদিনা নামক রাষ্ট্রটি ইতিহাসের অন্যতম একটি সফল রাষ্ট্রের নাম। এই মদিনাতেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অনুগত হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

মদিনা সংবিধানের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য

১. পূর্বের গোত্রগত যে ধারণা ছিল, তার পরিবর্তে নতুন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে—যার আওতায় সকলেই নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। সকল নাগরিক এমনকী ইহুদি ও মূর্তিপূজারিরাও একক একটি জাতি হিসেবে গণ্য হবে। (অনুচ্ছেদ ২০-এর খ এবং ২৫)

২. রাসূল ﷺ রাষ্টপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন এবং তিনিই চূড়ান্ত আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

৩. সব ধরনের স্বৈরতন্ত্র ও জুলুমের ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে (অনুচ্ছেদ ১৩, ১৫, ১৬, ৩৬ এবং ৪৭)। সাম্য ও সমতাই হবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান নীতিমালা (অনুচ্ছেদ ১৫, ১৭, ১৯ এবং ৪৫)।

৪. বাধ্যতামূলক চুক্তির যে বিধান আধুনিক আইনে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সফল প্রয়োগ মদিনা রাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম শুরু হয়। এর ফলে অন্যান্য গোত্র এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো মদিনা সনদের আওতায় চলে আসে।

৫. খুন, অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া, অপরাধের দায় প্রভৃতি বিষয়কে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণীত হয়। একই সঙ্গে রহিত করা হয় রাষ্ট্রের ঘোষিত শত্রুদের সাথে ব্যক্তিবিশেষের পৃথক চুক্তি করার পথও। ইহুদিদের যুদ্ধ-সামগ্রী ভোগ এবং যুদ্ধের ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্বাহ করার সুযোগ দেওয়া হয়। বলা হয়, যারা যুদ্ধব্যয়ে অবদান রাখবেন, তাদের আর জিজিয়া কর দিতে হবে না।

৬. ঐতিহ্যবাহী প্রথা হিসেবে রক্তঋণ (ব্লাডমানি)-সংক্রান্ত আইনটি বহাল রাখা হয়। তবে এক্ষেত্রে যে ধারাগুলো ত্রুটিপূর্ণ এবং নীতিবিরোধী, সেগুলোকে বাতিল করা হয়।

৭. এই সংবিধান একটি পরিপূর্ণ নথি যেখানে আইন প্রণয়ন, প্রতিরক্ষা, নতুন অভিযান, বহিঃশত্রু আক্রান্ত হলে করণীয়, আর্থিক সম্পদ, জাকাত, চুক্তি, পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করা হয়।

৮. মদিনার সংবিধানে এমন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা আইন প্রণয়ন[৩], বিচার সম্পাদন এবং নির্বাহী পদ্ধতি নামক তিনটি পৃথক বিভাগকে প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো এখন আধুনিক রাষ্ট্র-কাঠামোতেও অনুসরণ করা হচ্ছে।[৪]

মুতাজিলা এবং আশারাইতের মধ্যে বিতর্কের আলোকে মাওয়ার্দির চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করা হলে সেখান থেকে খুলাফায়ে রাশেদার অনুসৃত নীতিমালা ও মডেল বের করে আনা সম্ভব। এই অধ্যায়ে মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের নীতিমালাগুলো নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে। অতীতের বিভিন্ন কার্যক্রম ও গবেষণাকে পর্যালোচনা করে এবং বর্তমান সময়ের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণাকে সমুন্নত রেখে, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কোন ধরনের ইসলামিক রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায়, তা-ও সনাক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যদি তেমন কোনো মডেল না পাওয়া যায়, তাহলে ইজতিহাদের[৫] ভিত্তিতে কোন মডেলটি প্রণয়ন করা যায়, তা নিরূপণ করা হবে। আবার আধুনিক সময়ের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনাগুলোকে ধারণ করে মুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্ব—উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য কোনো রাষ্ট্রপদ্ধতি নির্ণয় করা যায় কি না, তা-ও এই অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে।

ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্বের মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য

রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আনসার সাহাবিরা বনু সাকিফায় সমবেত হলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনজন মুহাজির সাহাবিও যোগ দেন। তাঁরা হলেন আবু বকর, উমর এবং ওবায়দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ ﷺ। এই বৈঠকেই আবু বকর ﷺ মুসলিম উম্মাহর প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত হলেন।[৬] পরবর্তী সময়ে মসজিদে নববিতে সাধারণ একটি অধিবেশনে বাইয়াত গ্রহণ করার মাধ্যমে খলিফা হিসেবে আবু বকর ﷺ-এর নির্বাচনটি চূড়ান্ত হয়। বনু সাকিফার সেই বৈঠকে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণীত হয়—যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্বের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

১. শূরায় পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়টি দুটি ধাপে সম্পন্ন হবে। যেহেতু এই বিষয়ে নবিজি সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি, তাই এই সিদ্ধান্তটি নিতে হবে মুসলমানদেরই। এই কারণেই রাসূল ﷺ-এর পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপ্রধান কে হবেন, সেই ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়।

   পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় খলিফা উমর ﷺ সিনিয়র সাহাবিদের সমন্বয়ে একটি পৃথক পরিষদ গঠন করেন। এই পরিষদটি গঠিত হয় জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে। এই প্ল্যাটফর্মটিকে বলা হতো 'আহল আল হাল ওয়া আল আকদ'। এই ফোরামের সদস্যদের উদ্দেশ্য করে একবার উমর ﷺ বলেছিলেন—

'আপনাদের মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ না করে যিনি নিজের মতকে চাপিয়ে দিতে চাইবেন, অবশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে যে কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবেন।'[৭] পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে কুরআন ও হাদিসেও স্পষ্টভাবে সমর্থন করা হয়েছে। যদিও সময়, স্থান, কাল পাত্রভেদে এর ধরন পালটাতেও পারে; চার খলিফার নির্বাচনই এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৮]

২. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিকে বাছাই করার প্রধান মানদণ্ড—তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভয় ও পরহেজগারিতা। মাওয়ার্দি খলিফাকে রাষ্ট্রের বৈষয়িকপ্রধান[৯] হিসেবে তাঁর *আল আহকাম আল সুলতানিয়া* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০]

৩. নেতা নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় কোনো বিলম্ব করা যাবে না। এমনকী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খলিফা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর দাফন হওয়া পর্যন্তও অপেক্ষা করা হয়নি।[১১] কেননা, মুসলিম জনশক্তি একটা মুহূর্তও নেতৃত্ব ছাড়া থাকতে পারবে না।[১২]

আবু বকর رضي الله عنه সিনিয়র সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই উমর رضي الله عنه-কে দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নিয়োগ দিলেও মাওয়ার্দি এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিকে একজন ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত হিসেবেই মূল্যায়ন করেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও আইনবিদ মনে করেন, পরবর্তী সময়ে খলিফা ও সুলতানরা নিজেদের সন্তানদের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পেছনেও এই সিদ্ধান্তটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

মাওয়ার্দিও রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান, ইজতিহাদ, বিচার-বিবেচনা, সাহস, শারীরিক সক্ষমতা এবং কুরাইশদের সদস্য হওয়াকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে নির্ধারণ করেন। আবু বকর رضي الله عنه-এর দ্বিতীয় খলিফা নিয়োগসংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে মাওয়ার্দি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘোষণা হিসেবে অভিহিত করলেও সেটি রাষ্ট্রপ্রধানের যোগ্যতাসংক্রান্ত মানদণ্ডকে কীভাবে লঙ্ঘন করেছিল বা আদৌ করেছিল কি না—তা নির্ণয় করতে ব্যর্থ হন।

খলিফা হিসেবে উমর رضي الله عنه-এর বাছাই প্রক্রিয়াকে একধরনের নির্বাচন প্রক্রিয়া হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। কেননা, উমর رضي الله عنه-এর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নিয়োগ পাওয়া মোটামুটি অবধারিতই ছিল। তাঁর জ্ঞান, প্রশাসনিক যোগ্যতা,

বিচার-বিবেচনাবোধ, ইসলামের বিকাশে তাঁর ঐতিহাসিক অবদান কিংবা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং প্রথম খলিফা আবু বকর ؓ-এর ছায়াসঙ্গী হিসেবে তাঁর ভূমিকা নিয়ে কারও মধ্যেই কোনো প্রশ্ন ছিল না।

তৃতীয় খলিফা হিসেবে উসমান ؓ-এর নির্বাচন প্রক্রিয়া একটা মৌলিক নীতিমালাকে প্রতিষ্ঠা করে। তা হলো—খিলাফত পদটি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, খলিফা নির্বাচনের জন্য উমর ؓ একটি প্যানেল তৈরি করনে। সেখানে এই পদের জন্য যোগ্য হওয়ার পরও কেবল নিজের সন্তান হওয়ার কারণে তিনি তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বিন উমর ؓ-কে অন্তর্ভুক্ত করেননি। উমর ؓ তৃতীয় খলিফা নির্বাচন করার জন্য ছয় সদস্যের একটি নির্বাচনী প্যানেল গঠন করেন। এই ছয়জনের মধ্যে একজন ছিলেন আলি ؓ। তাই তৃতীয় খলিফা হিসেবে উসমান ؓ-এর শাহাদাতবরণের পর আলি ؓ-কে খলিফা নিয়োগ করা ছাড়া বিকল্প আর কোনো ব্যক্তিও ছিল না। ফলে উসমান ؓ-এর শাহাদাতের পর তিনি প্রত্যাশিতভাবেই চতুর্থ খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

বিদ্রোহীদের হাতে উসমান ؓ-এর নির্মম শাহাদাতের ঘটনা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়। সেইসঙ্গে ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্বে বিদ্রোহ করার আদৌ কোনো সুযোগ আছে কি না, সেই প্রশ্নটিও সামনে আসে; যদিও অধিকাংশ ইসলামি আইনজ্ঞ এই ধরনের বিদ্রোহকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

> ‘আমার পরে গভর্নরগণ তোমাদের শাসন করবে। যারা তোমাদের থেকে সকল দিক দিয়ে উঁচুমানের এবং আশা করা যায়, তাঁরা তাঁদের উচ্চমান বজায় রেখেই তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। আর যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা দুর্নীতি দিয়েই তোমাদের শাসন করবে। তোমরা তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করো এবং তাঁদের কথা শোনো, যতক্ষণ তাঁরা হকের ওপর অধিষ্ঠিত থাকে। যদি তাঁরা তাঁদের আচরণে সঠিক থাকে, তাহলে তাঁদের নেতৃত্বের কারণে তোমাদের এবং তাঁদের উভয়েরই কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আর যদি তাঁরা অন্যায় করে, তাহলে তোমাদের ঠিকই উপকার হবে (আখিরাতে)। তবে তেমনটা হলে, সেই ক্ষেত্রে তোমরা তাঁদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারবে।’[১৩]

ইসলামে কেবল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করার পথ খোলা রাখা হয়েছে। প্রখ্যাত তাবেয়ি আল হাসান আল বসরি (রহ.) যেকোনো ধরনের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে জিহাদকে নিষিদ্ধ করেছেন। 'অহেতুক বিতর্ক এবং গিবত করার চেয়ে ইসলামকে জানা ও অনুশীলন করা অনেক উত্তম'—এই কথাটি বলে কিছু কিছু ইসলামি চিন্তাবিদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকেও নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। ফলে সমাজে বা রাষ্ট্রে নৈরাজ্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, স্বৈরাচার ও জালিমের শাসন দীর্ঘায়িত হওয়ায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ তৈরি হয়।

এই কারণে জনপ্রিয় একটি ফিকাহর মত হলো—'যখন তোমাদের সামনে একই সঙ্গে দুটি খারাপ পরিস্থিতি আসে, তখন তুলনামূলকভাবে কম খারাপ পরিস্থিতিকে তোমরা গ্রহণ করো।'[১৪] আবু বকর ﵁ প্রথম খলিফা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পর বলেছিলেন—'যতক্ষণ আমি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করব, ততক্ষণ তোমরা আমার অনুসরণ করো। কিন্তু আমি যদি অন্যথা করি, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো না।'[১৫] এই কথাটিকে মূল উপজীব্য ধরে অনেক চিন্তাবিদ আবার বিদ্রোহ করার বিষয়টিকেও অনুমোদন দিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইরাক ও মিশর থেকে ধর্মান্তরিত ইহুদি আবদুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে একদল মানুষ মদিনায় আসে। তারাই প্রথমেই উসমান ﵁-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি এবং নিজের আত্মীয়দের গভর্নর বানানোর অভিযোগ তোলে। উসমান ﵁ তাদের যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করার পরও এই বিপথগামী দলটি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রাখে। তাদের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে অনেকেই খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহতেও অংশ নেয়।[১৬]

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির মূল্যায়নে রশিদ রিদা মনে করেন, যদি কোনো শাসক ন্যায়নিষ্ঠ, যোগ্য এবং কুরাইশ বংশের হন, তাহলে পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে ইমাম হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করা উচিত। যদিও খারিজিরা, ইবনে খালদুন এবং অটোম্যানরা এ ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন না।

যাইহোক, বিদ্রোহ কেবল তখনই বৈধ—যখন খলিফা তাঁর নৈতিক মান, শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন এবং ঈমান বিসর্জন দিয়ে জনগণের ওপর জুলুম শুরু করবেন। এই কারণে খলিফা নিয়োগকারী শূরা

'আহল আল হাল ওয়া আল আকদ' সব সময়ই নিপীড়ন ও নিপীড়কদের এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং একই সঙ্গে বিদ্রোহকেও নিরুৎসাহিত করে। কেননা, বিদ্রোহ যেকোনো সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে গোটা দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

আল গাজালি, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) প্রমুখ চিন্তাবিদগণ যেকোনো নৈরাজ্যকর বিদ্রোহ সৃষ্টি করার চেয়ে সাময়িকভাবে জুলুম মেনে নেওয়াকে সঠিক মনে করেছেন। কারণ, তাঁরা দুটি খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম খারাপ পরিস্থিতিটাকে বেছে নেওয়ার চিন্তা করেছিলেন। অনেক বছর পর এসে ১৯২৪ সালে তুর্কিরা অটোমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রশিদ রিদা এই বাস্তবতায় ইবনে তাইমিয়ার উপরিউক্ত চিন্তা-ভাবনার সাথে একমত হয়েছিলেন। কেননা, ইবনে তাইমিয়া-ই (রহ.) প্রথম নৈরাজ্য ও জুলুমের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সচেতন করেছিলেন।[১৭]

ঐতিহাসিকভাবেই ইসলামি চিন্তাবিদগণ স্থিতিবস্থাকে ধরে রাখার পক্ষে থাকেন। এই কারণেই, খলিফা নিয়োগকারী শূরা 'আহল আল হাল ওয়া আল আকদ'-এর দায়িত্ব হলো—খলিফা কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে মানছেন কি না, জনসম্পৃক্ত কাজগুলোতে সঠিকভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারছেন কি না এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপনে সরলতা-সাধাসিধে জীবনাচরণ অনুশীলন করতে পারছেন কি না তা তদারক করা। সেইসঙ্গে যারা পদলোভী, তারা যেন কোনোভাবেই এই পদে আসতে না পারেন—সেটা নিশ্চিত করাও এই শূরার দায়িত্ব।[১৮]

খলিফা নির্বাচন করতে মূল যে নীতিমালাগুলো নির্ধারণ করা হয়—তার মধ্যে রয়েছে পরামর্শ করা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, উত্তরাধিকার ও নির্বাচন। ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি থেকে শাসন করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত মূলনীতি পাওয়া যায় না।

তাই এভাবেও বলা যায়—শরিয়াহ রাষ্ট্র পরিচালনার সাধারণ কিছু নীতিমালা চিহ্নিত করেছে। আর বিস্তারিত প্রয়োগের বিষয়টিকে স্থান, কাল, পাত্রের ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। খলিফা নির্বাচিত হতে হলে তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও শরিয়াহ সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখতে হবে—যাতে তিনি ইজতিহাদ করতে পারেন। সেইসঙ্গে অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রবিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের মতো যোগ্যতাও থাকতে হবে। একই সাথে সাহস ও জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

একজন খলিফা সব সময় শরিয়াহর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং জনকল্যাণে কাজ করবেন। যতক্ষণ তিনি এই বিষয়গুলো করবেন, মুসলমানরা তার আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে। সেইসঙ্গে, তাকে সুপরামর্শ দেবে এবং ভুল দেখলে সংশোধন করবে। ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্বের এই নীতিমালাগুলো ইসলামের প্রথম চার খলিফা অনুসরণ করে গেছেন; যদিও তাঁরা পরিস্থিতির আলোকে কখনো কখনো কৌশলও পরিবর্তন করেছেন।[১৯]

শূরা (পরামর্শ)

ইসলামের রাজনৈতিক তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাই হচ্ছে—শূরা; তথা পরামর্শ করে কাজ করা। আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলেন—

> 'আল্লাহর রহমতের কারণেই আপনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পেরেছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তাঁরা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাঁদের ক্ষমা করে দিন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, তখন আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

শূরার গুরুত্বকে অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সব সময় রাসূল ﷺ-কে তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করার কথা বলেছেন। যদিও অনেক সময়ই সাহাবিদের মত আর রাসূলের মত হতো ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, রাসূল ﷺ সব সময় আক্রমণকারী শত্রুপক্ষকে মদিনা শহরের ভেতর থেকে মোকাবিলা করার পক্ষে ছিলেন, আর সাহাবিরা শহরের বাইরে শত্রুদের মোকাবিলা করতে চাইতেন। যদিও পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-এর চিন্তাধারাটাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তা সত্ত্বেও তিনি সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবির মতকে গ্রহণ করতেন। এই দৃষ্টান্তগুলোর মাধ্যমে প্রমাণ হয়, একজন নেতা কখনোই ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য গোয়ার্তুমি করবেন না, আবার পরামর্শ করার প্রক্রিয়া থেকেও বিরত থাকতে পারবেন না। পবিত্র কুরআনে সফল ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ আরও বলেন—

'যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামাজ কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।' সূরা আস-শুরা : ৩৮

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুহু মনে করেন, পরামর্শ করে কাজ করাটা বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে যারা সৎ কাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করাটা খুব প্রয়োজনীয়ও বটে। আবু হুরায়রা ﵁ বলেন—

'রাসূল ﷺ যেভাবে তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইতেন, আমি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে পরামর্শ করার ব্যাপারে এতটা আগ্রহী পাইনি।'

তবে যেই বিষয়ে ওহির সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে, সেই ইস্যুতে পরামর্শ না করলেও চলে। যদিও হুদাইবিয়া সন্ধির ব্যাপারে আল্লাহ ওহি নাজিল করার পরও রাসূল ﷺ সেই বিষয়ে সাহাবিদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করেছিলেন। শূরা বা পরামর্শসভার আরেকটি দায়িত্ব হলো—যে বিষয়গুলোতে ঐশ্বরিক বাণী বা ওহির কোনো পরিষ্কার বক্তব্য নেই, সেই বিষয়গুলোতে পূর্বে নাজিল হওয়া ওহিগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে একটি মতামত বা বক্তব্য প্রদান করা।[২০, ২১]

শূরা যে পরামর্শ দেয়, তা প্রত্যাখ্যান করা বা কোনো ধরনের ভেটো দেওয়া সংশ্লিষ্ট শাসকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের পরামর্শগুলো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতেন। শূরা পরিষদ যে শপথনামা তৈরি করে, তার আলোকে শপথ গ্রহণ করা খলিফার জন্য জরুরি; তা না হলে খলিফার অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধও হয়ে পড়তে পারে। অধিকাংশ আইনজ্ঞগণ শূরার প্রতি দায়বদ্ধতাকে অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। অল্প কিছুসংখ্যক আইনজ্ঞ এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে তাদের পক্ষে রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপন করেন—

'যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

রাসূল ﷺ শুধু হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাতেই সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন—বিষয়টা তা-ও নয়; বরং পরবর্তী আরও বেশ কিছু ঘটনায়। যেমন : সিরিয়াতে সৈন্য প্রেরণের সময় কিংবা ভণ্ড নবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় প্রথম খলিফা আবু বকর ﵁ শূরার পরামর্শ নিয়েছিলেন। আবার উমর ﵁ ইরাকের দখলকৃত জমি বণ্টন না করার সিদ্ধান্ত শূরার পরামর্শক্রমে নিয়েছিলেন।

তাবারি মনে করেন—ওপরে কুরআনের যে আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করতেই হবে; সেক্ষেত্রে শূরা যেই মতই দিক না কেন। যেমন : রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ার সন্ধির বেলায় সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে আল্লাহর দেওয়া ফয়সালাকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ যখন উমর ؓ-কে ওহির বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে বলেছিলেন, তখন উমর ؓ কি এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন মুসলমানরা শান্তিচুক্তিকে পরামর্শের আলোকে না নিয়ে বরং নাসিহা বা উপদেশকেই অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করবে? যদিও শূরার মত নেওয়া জরুরি ছিল না, তারপরও আবু বকর ؓ শূরার পরামর্শক্রমেই সিরিয়াতে সেনা পাঠানোর ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছিলেন। আবু বকর ؓ-এর এই সিদ্ধান্তটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে থেকে যায়। কেননা, এতে প্রমাণ হয়, শূরার প্রতি দায়বদ্ধ না থেকেও একজন নেতা শূরার সিদ্ধান্তকে চেতনাগত দিক থেকে ধারণ করতে পারেন। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায়, উমরও আবু বকর ؓ-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সমুন্নত রেখেছেন এবং তিনিও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শূরার মতামতটি বিবেচনায় রাখতেন।

ফলে দেখা যায়, ইরাকের ভূমি বণ্টন বিষয়ে নেওয়া সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উমর ؓ শূরাকে একমত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত শাসক এবং শাসিত উভয়ের জন্যই শূরার মত গ্রহণ কিংবা পরামর্শ নেওয়াকে ইবাদাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শাসকের দায়িত্ব হলো—শূরার মতকে ধারণ এবং যারা শাসিত তাদের দায়িত্ব হলো, সঠিক পরামর্শ দেওয়া। যদি শাসক শূরার মতকে অগ্রাহ্য করেন এবং শাসিত গোষ্ঠীও যদি যথাযথভাবে পরামর্শ না দেন, তাহলে তারা উভয়েই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করার দায়ে অভিযুক্ত ও গুনাহগার হবেন।

যেসব বিষয়ে ওহির সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যায় না, সেখানে তিনটি স্তরে কৌশল অবলম্বন করা যায় কিংবা বলা যায়, তিন ধরনের শূরা কাঠামো নির্ণয় করা যায়—

১. আহল আল হাল ওয়া আল আকদ অর্থাৎ রাসূল ﷺ এবং খলিফারা যে ধারাটি অনুসরণ করে গেছেন।
২. বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়—বিশেষ করে যুদ্ধ, পররাষ্ট্রনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতির বিষয়ে যারা ভালো জ্ঞান রাখেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং
৩. গণভোট/সংসদ/সাধারণ ভোট।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে চর্চা ছিল 'আহল আল হাল ওয়া আল আকদ'-এর শূরা সদস্যরা পরিষদের বৈঠকে মিলিত হতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তারপর সিদ্ধান্তগুলো জনগণের অনুমোদনের জন্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা হতো। রাসূল ﷺ এবং চার খলিফার সময় নির্দিষ্ট কোনো মজলিস, মন্ত্রিসভা বা সংসদের অস্তিত্ব ছিল না। তখন ভোটাভুটি হতো না। তাই সেখানে নির্দিষ্টভাবে কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘু বলতে কিছু ছিল না। ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল বলতে কোনো কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল না। শূরার কার্যক্রমগুলো ছিল ভীষণ রকম গোপন এবং শূরা সদস্যরা তাদের মতামতকে কখনোই প্রকাশ্যে নিয়ে আসতেন না। শূরার সদস্যরা শূরার যেকোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার দায়িত্ব শাসকের ওপরই ন্যস্ত করতেন। কেননা, কেবল শাসকেরই শূরার মুখপাত্র হিসেবে জনগণের সামনে উপস্থিত হয়ে কথা বলার সুযোগ ছিল।

শূরার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনগণের সামনে চলে আসার পর যারা শূরার বৈঠকে ভিন্ন মত দিয়েছিলেন, তারা কখনোই নিজেদের কোণঠাসা বা অসহায় মনে করতেন না। নিজেদের মত গৃহীত না হওয়ায় তাদের মধ্যে কোনো জটিলতাও কাজ করত না। কেননা, শূরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এক্ষেত্রে সব ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অহংকার উপেক্ষা করে ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনগণের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। শূরার এই প্রচেষ্টাকে ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ, এর উদ্দেশ্য ছিল শরিয়াহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ধারণ করেন—এমনসব ব্যক্তিদের সঙ্গে পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করা।

শূরার ভিত্তিতে রাসূল ﷺ-এর কিছু গৃহীত সিদ্ধান্তের উদাহরণ

বদরের পূর্বে : কুরাইশ গোত্রের একটি বণিক দল সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে এবং মদিনার পাশ দিয়েই তারা অতিক্রম করছে—এ রকম একটি খবর পেয়ে রাসূল ﷺ শূরার সাথে বৈঠকে বসলেন। তিনি এই বণিক দলটিকে তাড়া করার এবং যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি—যাদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার—রাসূল ﷺ-এর এই মতকে সমর্থন করলেন। বনি ইসরাইলরা যেভাবে মুসা ﷺ-কে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করেছিল, এক্ষেত্রে সাহাবিরা তা করেননি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ বেশ কিছু সাহাবি নিয়ে বণিক দলকে তাড়া করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। এই অভিযানে বের হওয়াটা ছিল একধরনের কৌশল। কারণ, কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের কাছে অভিযানের খবরটি পৌঁছলে তিনি মুসলমানদের পাত্তা দিতে বাধ্য হন। তখন বণিকদের সাহায্য করতে তিনি মক্কা থেকে বাড়তি লোকবল প্রেরণ করলেন। পরামর্শ দিলেন—তারা যেন তাদের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে।

এই অভিযানটি সফল হওয়ার পর রাসূল ﷺ দ্বিতীয় দফায় শূরার সাথে বসলেন। এবার আলোচনার বিষয় ছিল—তাঁরা কী অভিযান সমাপ্ত করে মদিনায় ফিরে যাবেন, নাকি মক্কা থেকে আগত কুরাইশরদের বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবিলা করবেন। অপরদিকে মদিনায়ও তখন মুনাফিক, বেদুইন, অমুসলিম আরব এবং ইহুদিরা শহরে মুসলমানদের অনুপস্থিতির সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাসূল ﷺ সাহাবিদের পরামর্শক্রমে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ৩১৩ জন সাহাবির সমন্বয়ে একটি বাহিনী গঠন করলেন।

এক্ষেত্রেও সাহাবিরা রাসূলের সিদ্ধান্তে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যক্ত করলেন। অবশ্য ইতোমধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহির মাধ্যমে বলা হয়—বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাঁদের জন্য বিজয় নির্ধারিত করে রেখেছেন। অতএব, তাঁরা যেন পুরস্কার প্রাপ্তির আশা নিয়েই যুদ্ধে গমন করে। এরপরও রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন—যাতে তাঁদের মনোবল, চেতনা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।[২২]

এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি—সঙ্গী বা সহযাত্রীদের মত দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে এবং তাদের মতামত দেওয়ার আগে কোনো দায়িত্বশীল নেতারই নিজের মত প্রদান করা উচিত নয়। বদরের যুদ্ধে রাসূল ﷺ অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুনজির নামক একজন সাহাবি যখন দেখলেন, রাসূল ﷺ ওহির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তটি (নিচু এলাকায় বসতি স্থাপন) নেননি, তখন তিনি উঁচু জমিতে একটি ঝরনার পাশে বসতি স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। কেননা, উঁচু এলাকায় বসতি স্থাপন করলে কুরাইশরা আর পানির কাছাকাছি থাকার সুযোগ পাবে না। উল্লেখ্য, মুনজির নামক সাহাবির এই মতটিও শূরার সিদ্ধান্ত হিসেবে আসেনি; বরং ব্যক্তিগত পরামর্শ হিসেবে এসেছে।

এতে বোঝা যায়, নেতার সামনে পরামর্শ বা মত দেওয়ার ব্যাপারে কারোই অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। সেইসঙ্গে যেকোনো অবস্থানে বা দায়িত্বে থেকেই একজন ব্যক্তি পরিস্থিতির আলোকে পরামর্শ দিতে পারবেন—এই ঘটনা থেকে এটিও বোঝা যায়। এই ধরনের অনুশীলন রাসূল ﷺ নিয়মিতই করতেন। অনেক সময় তিনি প্রকাশ্যে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেওয়ার আগে ছোট্ট পরিসরে সিদ্ধান্তটি শেয়ার করতেন। কারণ, তাঁরা যেন তাৎক্ষণিকভাবে সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজের মত দিতে পারে।[২৩]

যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে রাসূল ﷺ সবাইকে জানিয়ে দিলেন, যাতে আব্বাস এবং অপর একজন সাহাবিকে হত্যা করা না হয়। আব্বাস ؓ তখনও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। আবু হুজাইফা ؓ এই সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন। রাসূল ﷺ তখন উমর ؓ-কে প্রশ্ন করলেন, আব্বাস যে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাঁকে কে কে জানে? উমর ؓ আবু হুজাইফা ؓ-এর ভিন্নমতের কারণে তাঁকে কিছু বলতে গেলে রাসূল ﷺ তাঁকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন—'আবু হুজাইফা এ রকম ভিন্নমত দিয়েছে। কারণ, সে জানে না, আব্বাস গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর না জানার জন্য তাঁকে তিরস্কার করা সমীচীন হবে না।'

বদরের যুদ্ধের পরে : যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে কী করা হবে—এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ দ্বিতীয় দফায় শূরার বৈঠক ডাকলেন। আবু বকর ؓ ফিদিয়া চালুর পরামর্শ দিলে উমর ؓসহ আরও কিছু সাহাবি যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করার পরামর্শ দিলেন। এরপর রাসূল ﷺ কিছু সময়ের জন্য একটু ভেতরে গেলেন। ফিরে এসে তিনি জানালেন, আবু বকর ؓ-এর মতামতই সঠিক। উল্লেখ্য, আবু বকর ؓ ছিলেন সেই অল্প কয়েকজন সাহাবির মধ্যে একজন, যিনি জানতেন— যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এমন বেশ কয়েকজন রয়েছে, যারা এরই মধ্যে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই ঘটনার পরে রাসূল ﷺ আবু বকর ؓ-কে দুধের চেয়েও নরম আর উমর ؓ-কে পাথরের চেয়েও শক্ত বলে মন্তব্য করেছিলেন। এই তুলনা দিয়ে রাসূল ﷺ প্রমাণ করেন, মানুষের মধ্যে নমনীয়তা ও কঠোরতা—এই দুটি বৈশিষ্ট্যই সক্রিয় এবং সহজাতভাবে বিদ্যমান।[২৪]

এখানে দেখা যাচ্ছে, যদিও রাসূল ﷺ সবকিছুই আগে থেকে জেনে যেতেন এবং তাঁর কাছে ওহির মাধ্যমে নিয়মিত বার্তা আসত, তারপরও নিজ স্বার্থে তিনি কখনো নিজের মতটিকে আগে প্রকাশ করতেন না; বরং অন্যদের সুযোগ দিতেন।

তিনি হুট করে কারও মতকে প্রত্যাখ্যানও করতেন না। তিনি ইসলামি রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে শূরার অনুশীলনকে শাসক এবং শাসিত উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সুন্নত থেকে বারবার এই নির্দেশনাই পাওয়া যায়—মুক্তচিন্তা এবং মত প্রকাশের চর্চা হওয়ার আগে কারও ব্যক্তিগত মতামতকেই সিদ্ধান্ত হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে একমত হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন।[২৫] এখানে উল্লেখ্য, যুদ্ধবন্দিদের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরবর্তী সময়ে ফিদিয়ার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।[২৬]

ন্যায়বিচার

ন্যায়বিচার ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক নীতি—

> 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচার এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' সূরা নাহল : ৯০
>
> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদের সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন।' সূরা নিসা : ৫৮
>
> 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো; এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব ভালোভাবেই জানেন।' সূরা মায়েদা : ৮
>
> 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সংগত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনের যদি ক্ষতিও হয়, তবুও এর ব্যতিক্রম করো না। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়,

তবে মনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের চাইতে তাদের জন্য অনেক বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না।' সূরা নিসা : ১৩৫

'যখন তোমরা কথা বলো, তখন সুবিচার করো; যদিও তা কোনো আত্মীয়ের বিরুদ্ধে যায়, তারপরও সুবিচার করো। সেইসঙ্গে আল্লাহর কাছে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করো।' সূরা আনআম : ১৫২

'আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি—যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাজিল করেছি লৌহ—যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন—কারা তাঁকে না দেখার পরও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।' সূরা হাদিদ : ২৫

এই আয়াতের ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন—

'রাসূল ﷺ এবং ওহির ওপর পূর্ণ ঈমান এনে অনুসরণ করার অর্থ হলো—এমন কিছু লোক সেখানে থাকবে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে ন্যায়নিষ্ঠভাবে পরিচালনা করবে। কেউ যদি ওহির পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাহলে প্রয়োজনে লোহার দণ্ড ব্যবহার করে তাকে সংশোধন করতে হবে।'[২৭]

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) আরও বলেন—

'আল্লাহ তখনই একটি অমুসলিম সরকারকে বিজয় দান করেন, যখন তারা ন্যায়বিচার সমুন্নত করে এবং জালিম মুসলিম শাসককে পরাজিত করতে পারে।'[২৮]

'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' সূরা শুরা : ৪২

'আল্লাহ কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারও প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।' সূরা নিসা : ১৪৮

'তাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সঙ্গে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।' সূরা হজ : ৩৯

'এসব জনপদও তাদের আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।' সূরা কাহফ : ৫৯

'নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?' সূরা শুআরা : ২২৭

রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিস থেকে জানা যায়—

'কিয়ামতের দিন! যেদিন সবাই এক টুকরো ছায়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করবে, সেদিন যে সাত শ্রেণির লোক আল্লাহর আরশের ছায়ায় স্থান পাবে, তার মধ্যে একটি শ্রেণি হলো—ন্যায়বিচারকগণ।'[২৯]

রাসূল ﷺ আরও সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—

'তোমরা জুলুম করো না। কিয়ামতের দিন জালিমদের জন্য অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।'[৩০]

স্বাধীনতা

ইসলামিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরেকটি মৌলিক নীতিমালার নাম—স্বাধীনতা। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমানরা নিজেদের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করার জন্য ভিন্ন একটি দেশে হিজরত করেছিল—যেখানে তারা নির্দ্বিধায় এবং নির্বিঘ্নে আল্লাহর ইবাদত ও অন্যান্য ধর্মীয় আচারাদি পালন করতে পারবে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার মাধ্যমে এই অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনায় আরও প্রমাণিত হয়, বর্তমান সময়ে এসে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা অন্য কোনো অমুসলিম দেশে হিজরত করার বিষয়টিকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করেন, তারা মূলত কুরআন ও সুন্নাহর চেতনাকে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেননি। যেসব মুসলমানরা নিজেদের জন্মভূমিতে

নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন দিয়েছেন, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের প্রশ্ন করবেন—'তোমাদের সামনে কি হিজরত করার মতো বিকল্প কোনো সুযোগ ছিল না?'

এই বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হবে—মুসলমানদের ওপর রিসালাতের একটি দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। আর রিসালাতের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। এই কাজটি করতে গেলে চিন্তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা অপরিহার্য। মুসলমানদের চিন্তা করেই বের করতে হবে—তারা যে পরিস্থিতিতে আছে, তাতে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্বটি কি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক কাজের আওতায় পড়বে, নাকি মুবাহ তথা অনুমোদনযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে?

উল্লেখ্য, মুবাহ হলো এমন কিছু কাজ—যা মুসলমানেরা ইচ্ছা করলে করতেও পারে, আবার না-ও করতে পারে। কিন্তু ওয়াজিব কাজ মুসলমানদের অবশ্যই করতে হবে। জেনে-শুনে কোনো ওয়াজিব কাজকে অবহেলা করা রীতিমতো পাপের সমতুল্য। রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল ধাপেই একজন মুসলমানকে এই সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার আমল করতে হবে।

সাম্য

আমেরিকায় নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কিত 'বিল অব রাইটস' এবং খ্যাতনামা দার্শনিক রুশোর 'সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই মহাগ্রন্থ আল কুরআন ঘোষণা করেছে—

> 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।' সূরা হুজুরাত : ১৩

রাসূল ﷺ এই প্রসঙ্গে বলেন—

> 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জাহেলিয়াত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের পাপাচার এবং তোমাদের পূর্বসূরিদের অহংকারের হাত থেকে হেফাজত করেছেন। তুমি ধার্মিক মুসলমান হও কিংবা কোনো দুঃস্থ চরিত্রহীন, তুমি আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরি।'[৩১]

বিদায় হজের ভাষণে রাসূল ﷺ আরও বলেন—

> 'আজ থেকে অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কালোর ওপর সাদা চামড়ার মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হবে তাকওয়া তথা আল্লাহভীরুতা। আইনের চোখে ধার্মিক বা অধার্মিক—সবাই সমান। ধার্মিক ব্যক্তি তার সদাচরণের পুরস্কার পাবে পরকালীন জীবনে।'[৩২]

একবার এক সাহাবি অভিজাত বংশের একজন নারীর পক্ষে মধ্যস্থতা করতে এলেন—যার বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় রাসূল ﷺ বললেন—

> 'আল্লাহর কসম! যদি নবি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলেও আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম।'

প্রথম খলিফা আবু বকর رضي الله عنه খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেওয়া প্রথম ভাষণে বলেন—

> 'আজ থেকে তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারা আমার চোখে সবল হবে; যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি তাদের অধিকার সুরক্ষা করতে পারছি। আর যারা তোমাদের মধ্যে সবল, তারা আমার চোখে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল বলে গণ্য হবে, যতক্ষণ না আমি তাদের ক্ষমতাকে হ্রাস করতে না পারি।'

একবার চতুর্থ খলিফা আলি رضي الله عنه মামলার বাদী হিসেবে একজন কাজির সামনে উপস্থিত হলেন। আলি رضي الله عنه একজন ইহুদির বিরুদ্ধে তার ঢাল চুরির অভিযোগ আনলেন। যখন কাজি তাঁর পাশের আসনে খলিফা আলি رضي الله عنه-কে বসার জন্য অনুরোধ করলেন, তখন আলি رضي الله عنه সেই প্রস্তাব বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দেন—ওই আসনে তাঁর বসা ঠিক হবে না।

কারণ, দোষ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইসলাম বাদী-বিবাদী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে সমতা স্থাপনের কথা বলে। তাই বাদী হিসেবে আলি ﷺ বিচারকের পাশের আসনে বসলে সাম্যের সেই আইন লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অন্যদিকে, বিচারক বিচারের সময় ইমাম হাসান ﷺ-এর সাক্ষ্যকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কারণ, সাক্ষী হাসান ﷺ ছিলেন বাদী আলি ﷺ-এর সন্তান। শেষ পর্যন্ত বিচারক অভিযুক্ত ইহুদিকে ঢালটির মালিকানা প্রদান করেন। অন্যদিকে সেই ইহুদি বিচারক ও খলিফার ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ এবং ইসলামের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

জবাবদিহিতা এবং সরকারপ্রধান

শাসিত ব্যক্তিরা যেহেতু শাসকের আনুগত্য করতে বাধ্য এবং শাসক নাগরিকদের যেকোনো বিদ্রোহ দমন করার ক্ষমতা রাখে; তাই শাসক যদি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহলে শাসিত ব্যক্তি সেই ব্যাপারে জবাবদিহিতা চাওয়ার অধিকার রাখেন। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন—

> 'যখন তারা ফিরে যায়, তখন সেখানে ক্ষতিকর কিছু করার চেষ্টা করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও নাগরিকদের প্রাণনাশও করতে পারে। আল্লাহ ফ্যাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।' সূরা বাকারা : ২০৫

অন্যদিকে রাসূল ﷺ বলেন—

> 'তোমরা নিজেরাই নিজেদের কাজের জন্য দায়বদ্ধ।'[৩৩]

তিনি আরও বলেন—

> 'একজন মুসলমানের উচিত তার দায়িত্বশীলের আদেশ অনুসরণ করা; তা সে পছন্দ করুক অথবা না করুক। আনুগত্য করার দায় থেকে তখনই সে মুক্ত হবে, যখন তার ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি তাকে পাপ কাজ করার আদেশ দেবেন। সেক্ষেত্রে আর সেই আদেশটি মানার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর ﷺ বলেছেন—'আনুগত্যই হলো উত্তম সদাচার।'

একইভাবে একজন শাসক যদি তার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অপব্যবহার বা অমর্যাদা করেন কিংবা অনৈতিক কোনো কাজ করেন অথবা জুলুম করেন কিংবা কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো কাজ করেন, তাহলে তাকেও তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ করা যাবে।

উপসংহার

এটা স্পষ্ট, আব্বাসীয় প্রশাসনের একজন নীতিনির্ধারক ও গুরুত্বপূর্ণ দূত হওয়ার সুবাদে মাওয়ার্দি আব্বাসীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের শেষাংশকে সফলতার সাথে পর্যালোচনা করতে পেরেছেন। সেইসঙ্গে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের মতামতও একত্রিত করতে সক্ষম হন। উল্লেখযোগ্য এই বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে—খলিফা নির্বাচন, খলিফা এবং শীর্ষস্থানীয় আলিমদের যোগ্যতার মানদণ্ড এবং গভর্নর বাছাই ও নিয়োগ প্রসঙ্গ, জনগণের কল্যাণের স্বার্থে ইজতিহাদের প্রয়োগ ও অনুশীলন, বিচারবিভাগ, নামাজ, ইমাম নিয়োগ, হজ প্রশাসন, জাকাত, গনিমত, জিজিয়া, খারাজ, আঞ্চলিক নিয়ম ও সংস্কৃতি, পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুনর্বণ্টন, ভূমি সংরক্ষণ, দান ও অনুদান, অপরাধ, ন্যায়পাল এবং হিসবাহ।[৩৪]

তবে একজন শাসক শরিয়াহর বিধান প্রয়োগ করলেও জালিম হতে পারেন। তেমনটা হলে কী করণীয় কিংবা একজন দুশ্চরিত্র শাসক রাষ্ট্রের প্রধান কাজি হিসেবে কোনো বিষয়ে রায় প্রদান করতে পারবেন কি না—এই সমস্ত বিষয়ে মাওয়ার্দি কোনো মতামত দিয়ে যাননি। যদিও পরবর্তীকালের মুসলিম গবেষকদের মধ্যে রশিদ রিদা এবং মাওলানা মওদূদী (রহ.) দুশ্চরিত্রবান শাসকদের রায় দেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যাহারের পক্ষে মত দিয়েছেন।

শুধু তা-ই নয়, তাঁরা মুয়াবিয়া ﵁-কে দীর্ঘ ২০ বছর গভর্নর পদে রাখার সিদ্ধান্তকেও সমালোচনা করেছেন। কেননা তাঁদের মতে, এত দীর্ঘ সময় গভর্নর পদে থাকার কারণেই মুয়াবিয়া ﵁-এর আলাদা গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল। যাহোক, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই একমত হয়েছেন—ইসলামে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নীতি প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই।

আরেকটি বিষয় হলো—ইসলামের প্রথম যুগে পরামর্শ পরিষদের সাথে শলা-পরামর্শ করে রাষ্ট্র পরিচালনার যে ধারাটা ছিল, খোলাফায়ে রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তা-ও বিলুপ্ত হয়। উমাইয়া যুগের একেবারে শুরুতে

একবার একজন খলিফা জুমার নামাজের সময় খুতবা শুরু করে সেটাকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছিলেন। উপস্থিত একজন সাহাবি এত দীর্ঘ খুতবার সমালোচনা করে আল্লাহকে ভয় করার কথা খলিফাকে স্মরণ করিয়ে দেন। সাথে সাথে সেই সাহাবির শিরশ্ছেদ করা হয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই যারা সত্যিকারে ফিকাহবিদ ছিলেন, যেমন : আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), তাঁরা উক্ত জমানায় প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কেননা, তাঁরা জানতেন—তাঁদের যেকোনো সিদ্ধান্ত শাসকের মনঃপূত না হলে এর পরিণতিতে কারাবরণ করতে হতে পারে; এমনকী তাঁরা অন্যায্য হত্যাকাণ্ডেরও শিকার হতে পারেন।[৩৫]

শাসক এবং শাসিত—উভয়পক্ষের জন্যই শূরা বা পরামর্শ করার বিষয়টি ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক ইবাদতের মতো। যিনি বা যারাই শূরা করার প্রক্রিয়াকে অবহেলা করবে, তারা গুনাহর ভাগীদার হবে বলেও মনে করা হতো। একই সঙ্গে, মুসলমানরা এ-ও বিশ্বাস করতেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্ট থাকেন এবং নিয়ামত দান করেন। ইতঃপূর্বে, বদর ও উহুদের যুদ্ধেও আল্লাহ সেভাবেই মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন।

ইসলামে ভেটো দেওয়ার কোনো বিধান নেই। যদি দিতেই হয়, তাহলে শূরা পরিষদ শাসকের পক্ষে অবস্থান নেবে। রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর প্রথম খলিফা আবু বকর رضي الله عنه যখন সিরিয়াতে অভিযান পরিচালনা করলেন কিংবা তিনি যখন মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কিংবা মুসলমানদের একটা অংশ জাকাত দিতে অস্বীকার করলে, তখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর বিষয়েও তিনি শূরার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

একই সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা যায়—প্রথম দিকের আইনজ্ঞ ও ফিকাহবিদরা নিয়মিতভাবে ইজতিহাদ চর্চা করতেন, যদিও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁরা সেই ইজতিহাদকে বাধ্যতামূলক করে যাননি। ইজতিহাদ কোন আমলে কতটুকু প্রয়োগযোগ্য—তা নির্ভর করে মাসয়ালা (জনকল্যাণ), উরফ, ইসতিহসান এবং কিয়াসের ওপর। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিয়মিতভাবেই ইজতিহাদও পরিবর্তিত হতে পারে। ইসলামের প্রথম যুগে এ রকমও দেখা গেছে—মদিনার আলিমরা একটি মত দিলে ইরাকের আলিমরা তার থেকে ভিন্নমত দিচ্ছেন। কিন্তু কখনোই এই ভিন্নতার কারণে একপক্ষ অপরপক্ষকে অমুসলিম বা গোমরাহি বলেননি; বরং তারা অনুধাবন করেছেন—খুব সম্ভবত অপরপক্ষ তাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির আলোকে ভিন্ন সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। পরবর্তী যুগগুলোতেও এই চিন্তাধারা ও মানসিকতা লালন করা হয়েছে।[৩৬]

উরফ'র ভিত্তিতে ইসলাম স্পষ্টভাবে হজ, মূর্তি অপসারণ এবং কাবার চারপাশে নগ্ন অবস্থায় তাওয়াফের বিধানকে সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীরূপে নিষিদ্ধ করে দেয়। ওপরে বর্ণিত ধর্মীয় চিন্তাধারার আলোকে বলা যায়—বর্তমান ও ভবিষ্যতের যেকোনো দৃষ্টিভঙ্গি, নীতিমালা, এমনকী পশ্চিমা রাজনৈতিক পদ্ধতিও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অবলম্বন করা যাবে—যদি তা শরিয়াহ, কুরআন ও সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। ইসলাম যদি সর্বজনীন হয় (অবশ্যই ইসলাম সর্বজনীন) তাহলে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে নতুন নতুন চিন্তা ও গবেষণার আলোকে ইতিবাচক যে দিকগুলো সামনে এসেছে, সেগুলোকে ধারণ করার মতো অবস্থান ও সক্ষমতাও ইসলামের থাকতে হবে।

ভুল এবং ঝুঁকির আশঙ্কা থাকায় লেখক বেশ কিছু রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশেষ করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, হুকুমে এলাহি, ধর্মতত্ত্ব, গণতন্ত্র এবং ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে এই বিষয়াবলির অবস্থানসংক্রান্ত বিধানগুলোকে এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। একই সঙ্গে, অমুসলিম দেশগুলোর (দার-আল হারব এবং দার আল বাইয়্যাহ) রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণের বিষয়টিকেও এই অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়নি। যদিও ড. হামিদুল্লাহ[৩৭] মনে করেন—মাক্কি যুগে মুসলমানদের কার্যক্রমকে তৎকালীন মুশরিকদের প্রবর্তিত আইনের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয়নি; বরং রাসূল ﷺ নিজের জ্ঞান ও ওহির নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়গুলোকে বিবেচনা করেছেন। সেই বিবেচনায় তৎকালীন পরিস্থিতিকে রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটি রাষ্ট্র (ডিপ স্টেট কাঠামো) হিসেবেও অভিহিত করা যায়। এই বিষয়টি এবং এই প্রসঙ্গে এর আগে আরও যে বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে—সেগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে আরও বিস্তর গবেষণার প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

১. লেখক এক্ষেত্রে মাওয়ার্দির রাজনৈতিক ভাবনাকে চমৎকারভাবে পর্যালোচনা করেছেন। মাওয়ার্দির পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিরা কীভাবে এই বিষয়গুলোকে নিয়ে ভেবেছেন, তা-ও তিনি উপস্থাপন করেছেন।

২. Mikhael Hanna, *Politics and Revelation: Mawardi and After* (Edinburg, Scotland, UK: Edinburg University Press, 1995)

৩. রাসূল ﷺ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও গোত্র প্রধানদের কাছে ৩০টি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ৮০টি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন, ৩৩টি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন এবং ৮৫টি সমর অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

৪. Muhammad S. Qureshi, *Foreign Policy of Hadhrat Muhammad* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1993)

৫. Muhammad S. *El-Awa, On the Political System of the Islamic State,* trans. Ahmed Naji al-Imam (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1980)

৬. AL Bukhari, #2462

৭. একটি চমৎকার সূচনা মন্তব্যের মাধ্যমে মুমতাজ আহমেদ এখানে ইসলামিক রাজনৈতিক তত্ত্বকে নির্ণয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আরও যেসব মহান ব্যক্তিগণ ইসলামের রাজনৈতিক ভাবনাগুলোকে নিয়ে কাজ করেছেন, তা-ও তিনি উপস্থাপন করেছেন।

৮. Mumtaz Ahmed (ed.), *State Politics and Islam* (Indianapolis, IN: American Trust Publications, 1986)

৯. এই বইতে লেখক ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতির উৎস ও বিন্যাস, এর নীতিমালা ও লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমান সময়ের আলোকে ইজতিহাদ করার বিষয়েও তিনি মতামত প্রদান করেছেন।

১০. El-Awa, *On the Political System of the Islamic State*

১১. ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি মূলত নিয়মতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের কোনো বিকল্প নেই। উম্মাহকে কোনো অবস্থাতেই নেতৃত্বহীন করা যাবে না।

১২. Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Austin, TX: University of Texas Press, 1982)

১৩. Attermethe, # 1849, Muslim # 1854

১৪. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বা ইসলামিক দলের নেতার প্রধান যোগ্যতা হবে নেক আমল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহি এবং মানবাধিকারের বাস্তবায়ন।

১৫. Majid Ali Khan, *The Pious Caliphs* (Safat, Kuwait: Islamic Book Publishers, 1995)

১৬. ইসলামিক রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, তাকিয়াহ ও শাহাদাতসংক্রান্তে রশিদ রিদার ভাবনাগুলো এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

১৭. Al Bukhari : 6722

১৮. Muhsin Mahdi, *Political Philosophy in Islam* (1991)

১৯. Abdullah al-Ahsan, *Ummah or Nation*? Identity *Crisi in Contemporary Muslim Society* (Leicester, UK: Islamic Foundation, 1992)

২০. Al Bukhari : 4844, Muslim : 1783, 1785, 1807

২১. Al Bukhari : 4609, Albani : 3340

২২. আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল একজন ইহুদি, যিনি মুসলমান সেজে ছিলেন এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নানা ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছিলেন।

২৩. Muslim : 1763

২৪. এই হাদিসটি দুর্বল।

২৫. Yushau Sodiq, 'Imam Malik's concept of Maslahah: The Consideration of the Common Good,' unpublished PhD dissertation (Temple University, Philadelphia, 1992)

২৬. Ahmed, *State Politics and Islam*

২৭. Proctor J. Harris (ed.), *Islam and International Relations* (Durham NC: Duke University, 1968)

২৮. Al Bukhari, # 6806

২৯. Muslim : 2578

৩০. Ibn Taymiyyah, 220/I

৩১. Ibn Majah : 2494

৩২. Al Bukhari : 2558

৩৩. Hanna, 1995

৩৪. মাওয়ার্দির বইতে এ রকম একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আদল প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শরিয়াহর কিছুটা ঘাটতি আছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা সূরা আল মায়েদায় ৩ নং আয়াতে বলে দিয়েছেন—'আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।' এরপরও কেউ যদি ইসলামকে অসম্পূর্ণ মনে করেন, তাহলে এটা তার নিজস্ব সংকট এবং ইসলামের বলিষ্ঠ ঘোষণার সাথে সাংঘর্ষিক।

৩৫. ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাসয়ালা মোটামুটিভাবে সর্বজন গ্রহণযোগ্য মতবাদ—যেখানে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য ইজতিহাদ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

৩৬. Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam* (Lectures at Bahwalpur University, 1963)

৩৭. Muhammad Hamidullah, *The Emergence of Islam*, page 155-157 হামিদুল্লাহই প্রথম কোনো চিন্তাবিদ, যিনি রাষ্ট্রের ভেতরে থাকা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা দেন।

ইউরো-আমেরিকান আইনশাস্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস : ইসলামিক বিকল্প—পিটার এম. রাইট

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা ও সাবেক ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে যে আইনি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আছে। এই অঞ্চলগুলোর আইনি পদ্ধতিতে বেশ কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ উপকরণ রয়েছে, যেগুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না কিংবা তেমন একটা নিরীক্ষাও চোখে পড়ে না। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সাদৃশ্যপূর্ণ উপকরণগুলো নিয়ে কাজ এবং সেগুলোকে গঠনমূলকভাবে বিশ্লেষণ করব। সেইসঙ্গে প্রচলিত এই আইনি পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে সামনে আসা ইসলামি শরিয়াহ নির্দেশিত আইনি পদ্ধতির সাথেও একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

আমাদের আগে কী ছিল, তা জানতে গিয়ে আমরা প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি। আমরা যে বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত, সেগুলোও অনেক সময় নানা তথ্য আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। তাই কখনো কখনো কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বলার চেয়ে বরং আমরা কোন জিনিসটিকে আগে থেকে চিনি বা জানি—তা বলতেই যেন বেশি ব্যস্ত থাকি। ফরাসি চিন্তাবিদ তেজভেতেন তোদোরোভ, তার বিখ্যাত রচনা 'Essay in general anthropology'-তে সর্বপ্রথম এই কৌশলটি অবলম্বন করার কথা বলেন।

এই অধ্যায়ের সূচনায় তোদোরভের এই রচনাকে উদ্বৃত করলাম। কেননা, আমিও আমার জানা চৌহদ্দিকেই ব্যাখ্যা করার কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। কারণ, যে বিষয়গুলো স্পষ্ট বা অন্তত আমার কাছে যেগুলোকে স্পষ্ট বলে মনে হয়, অন্যের সহযোগিতা ছাড়া সেগুলোকে নিয়েও আলোচনা করার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য বলে মনে করি না।

তোদোরভের রচনাবলির প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম হলো—'*A Brief Look at the History of Thought*' এই অধ্যায়টি আমাকে নতুন করে কিছু সংকটের মাঝে ফেলে দিয়েছে, যার জন্য আমি তোদোরভের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছি। যদিও হিস্ট্রি বলতে আলাদা করে কোনো হিস্ট্রিকে না বুঝিয়ে সকল ধারার ইতিহাসকেই বোঝায়। তবে তোদোরভ এখানে হিস্ট্রি বলতে সব ইতিহাসকে ইঙ্গিত করেননি। তিনি কেবল ইউরো-আমেরিকান চিন্তাধারার ওপরই আলোকপাত করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তোদোরভ তার প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামের সম্মান রাখতে পারেননি।[১] আর সেই কারণেই আমি বলেছি—আমাদের আগে কী ছিল, তা শনাক্ত করতে গিয়ে আমরা প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করি। এমনকী আমাদের মধ্যে যে বা যারা সবচেয়ে মেধাবী, তারাও এই কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে পারেননি।

তারপরও আমি তোদোরভকে ক্ষমা করে দেবো। কেননা, তিনি তার সীমাবদ্ধতাকে বেশ ভালোভাবেই অতিক্রম করে অদ্ভুত কিছু তথ্যকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তিনি পরিচিত সীমানার ভেতরেই এমন কিছু বের করেছেন—যা এতদিন দৃশ্যমান ছিল না। যেমনটা তিনি বলেছেন—

> 'কেউ যদি ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনাকে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে—যা এই পর্যন্ত খুব কম ব্যক্তিই করতে পেরেছেন, তাহলে মানুষের একটি নতুন সংজ্ঞা তার সামনে এসে উপস্থিত হবে। নতুন এই সংজ্ঞায় মানুষকে একাকী এবং অসামাজিক হিসেবে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।'

তোদোরভ তার ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনার বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে গিয়ে সমাজবিরোধী কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর তারপর তিনি তার দাবির সপক্ষে নানা ধরনের যুক্তি ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন।[২]

তোদোরভের যুক্তিতর্ক ও পর্যালোচনাকে নিয়ে কাজ করার আগে আমাদের আরেক দফা পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি তোদোরভের ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনাকে অসামাজিক বলে ধরেও নিই, তারপরও কথা থেকে যায়। কেননা, দর্শন এক জিনিস আর এর বিপরীতে আইন হলো সম্পূর্ণ উলটো দিকে।

একজন তাত্ত্বিক গবেষক হিসেবে তোদোরভ দার্শনিক সাহিত্যকেই তার গবেষণার উপজীব্য হিসেবে বাছাই করে নিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপিয়ান বা ইউরো-আমেরিকান আইন পদ্ধতির মতো এত বিশাল একটি বিষয় কী শুধু বই-পুস্তক দিয়েই অনুধাবন করা যায়?

তোদোরভ যে বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাগুলোর কথা বলেছেন, আমি বরং এক্ষেত্রে সেই ধারাগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিবেচনায় নেওয়ার পক্ষে। এই যোগসূত্র স্থাপন করতে গেলে আমাদের তোদোরভের বইয়ের বাইরে আরও কিছু বিষয় সম্বন্ধে জানতে হবে। বিশেষ করে আরেক ফরাসি দার্শনিক পিয়েরে বোর্দিওর কার্যক্রমের ব্যাপারেও আমাদের ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে।

বোর্দিও অধ্যয়ন করাটা মোটেই সহজ কাজ নয়। তিনি তার রচনায় সব সময় জটিল ও যৌগিক বাক্য ব্যবহার করেছেন। একই বাক্যে একাধিক বাক্যাংশ শুধু একটি কমা দিয়ে সংযুক্ত করেছেন। পাশাপাশি তিনি নিজের মতো করে কিছু শব্দভান্ডারও ব্যবহার করেছেন—যা আটলান্টিকের ওপারের অনেক মানুষের কাছেই খুব একটা পরিচিত নয়। আমি বাধ্য হয়েই বোর্দিওকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসেছি। তবে বোর্দিও পাঠ কঠিন হওয়ায় আমি সম্মানিত পাঠক মহলের ধৈর্য কামনা করছি। সত্যি কথা হলো, আমার হাতে বিকল্প কোনো তথ্যসূত্র থাকলে আমি বোর্দিওর কাজের ওপর নির্ভর করতাম না।

ইউরোপিয়ান এবং ইউরো-আমেরিকান আইনি পদ্ধতির ওপর বোর্দিওর মতামত আমরা প্রথমবারের মতো প্রথম জানতে পারি তার একটি কলাম থেকে—যা 'দ্য হাস্টিং ল' জার্নালের ৩৮ তম সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কলামে বোর্দিও একটি নতুন ধারার আইনের কথা বলেছিলেন। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন—আইনের সশ্রম বিজ্ঞান। নতুন ধারার এই আইনের প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে বোর্দিও নিজেকে তিনি সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এবং বিজ্ঞানকে প্রচলিত ধারার আইনশাস্ত্র থেকে আলাদা করার দাবি করেছিলেন।[৩]

আইন কী একেবারেই নিজের মতো করে সামাজিক জগতে বিকশিত হবে, নাকি সমাজের ক্ষমতাবান শ্রেণির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে, এই নিয়ে ইউরোপীয় আইন বিশেষজ্ঞদের যে বিতর্ক ছিল, বোর্দিও নিজেকে তা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এই দুই চিন্তাধারার বাইরে তিনি তৃতীয় একটি ধারার প্রবর্তন করেন—যেখানে পূর্ববর্তী উভয় ধারা থেকেই কিছু উপাদান থাকবে। তবে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসংবলিত কোনো উপকরণ থাকবে না।[৪]

তৃতীয় এই ধারাটি উন্মুক্ত করতে গিয়ে বোর্দিও তার নিজের ধারণামতো কিছু কৌশল অবলম্বন করেন। এখানে উদাহরণ হিসেবে 'নোশন অব হ্যাবিটাসের' কথা বলা যায়। বোর্দিওর কলামের অনুবাদক রিচার্ড টার্ডিমানের দাবি অনুসারে এই হ্যাবিটাস শব্দের অর্থ—মানবিক অভ্যাস। অর্থাৎ মানুষের বোঝার, বিবেচনা করার এবং প্রতিক্রিয়া দেখানোর যে অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, সেগুলোকে এই হ্যাবিটাস শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়। টার্ডিম্যান আরও লিখেন—

> 'বোর্দিওর এই ধারাটি অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থান, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মর্যাদা, পেশাগত ভিন্নতা এবং আঞ্চলিক ভিন্নতাকে ইঙ্গিত করে এবং দাবি করে—এই প্রত্যেকটি ভিন্নতাই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফসল।'[৫]

বোর্দিওর এই চিন্তাটা আমার কাছে অনেকটা সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাধারার মতো মনে হয়। সমাজবিজ্ঞান যেমন একজন মানুষের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা করার এবং পৃথিবীর সদস্য হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার একটি কাঠামো প্রণয়ন করে, বোর্দিওর কথাগুলোও অনেকটা একই রকম বার্তা দেয়।

যারা স্বার্থ, মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করেন, বোর্দিও এই সব বিষয়াবলিকে তাদের প্রতীকী ক্ষমতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ক্ষমতার আলোকেই তারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আইন প্রয়োগ করেন। যারা আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে লোকবল নিয়োগ করেন, তারা শুধু নিজেদের সমমনা সদস্যদেরই নিয়োগ দেন না; বরং একই ঘরানার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের বসিয়ে গড়পড়তায় একটা সাধারণ অভ্যাস প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি, যে কেউ তোদোরভের ইউরোপীয় দর্শন-ভাবনার সঙ্গে আইনের একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। তবে আইনবিদ এবং বিচারকরা এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বকে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ততটা বিবেচনা করেন না; বরং অতীতে তারা আইনি যে প্রশিক্ষণগুলো পেয়েছেন, সেই সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই অধিকতর বিবেচনা করেন। তারা এই তত্ত্বগুলোকে আদর্শিকভাবে ততটা ধারণ করেন না, তবে বিভিন্ন ধরনের অনুমান, আশঙ্কা এবং ধারণা নেওয়ার ক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে কাজে লাগান। ইউরোপিয়ান এই তত্ত্বগুলো মূলত একটি চশমার মতো, যা দিয়ে পশ্চিমা জগতের শিক্ষিত মানুষেরা গোটা পৃথিবীকে মূল্যায়ন করেন।

বোর্দিও যে সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিয়ে গেছেন, তা অনুধাবন করার জন্য ফরাসি বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রয়োজন নেই। ১৯৯২ সালে এসে জন সিমন প্রখ্যাত দার্শনিক 'লোকির' অধিকার তত্ত্বকে যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন—

তার ভেতর দিয়ে অনেকগুলো পর্যবেক্ষণ বেরিয়ে আসে। এই পর্যবেক্ষণগুলোর মাধ্যমেই নোশন অফ হ্যাবিটাস বা অভ্যাসসংক্রান্ত ধারণা বোঝা সহজ হয়ে যায়। এমনকী বোর্দিওর সমাজবিজ্ঞানসংক্রান্ত তত্ত্বের কাছে না গিয়েও এই ধারণা পাওয়া সম্ভব।

> 'ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলোতে বাস্তব জীবনে, শিক্ষাখাতে এবং শিক্ষাবহির্ভূত খাতে লোকির অধিকার তত্ত্বের বিস্তর প্রয়োগ হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেও এই তত্ত্বের অনেকখানি প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যার ভিত্তিতে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ এই সব তথ্যের আলোকে সেখানকার নৈতিকতার একটি কাঠামো নির্মিত হয়। আমেরিকার পড়ুয়া ছাত্রদেরও লোকির তত্ত্বের অন্তত কিছু অংশ পড়তে হয়। বিশেষ করে সেই অংশটি, যেখানে লোকি নিজেই স্বীকার করে গেছেন—"সকল মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিকর্তা তাদের প্রত্যেককে বিশেষ কিছু অধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে পাঠিয়েছেন—যার মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখের অন্বেষণ।"'[৬]

এখানে আমি এ-ও উল্লেখ করতে চাই, এই সকল ছাত্ররা সেই বিষয়টিও তখন জেনে যায়—লোকি ঐশ্বরিক কোনো এক সত্তা এবং তার কাছ থেকে নিয়ামত পাওয়ার বিষয়টিকে স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষ বা তার আত্মার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারগুলোকে নির্ণয় করেছেন। একই সঙ্গে সমাজ যেভাবে এই সব অধিকারকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতেও শিখিয়েছেন।

তোদোরভ তার গবেষণায় মত দিয়েছেন—পশ্চিমা জগতের যে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারা, তা মূলত সমাজের মূল কাঠামোর বিরোধী। তিনি তার এই মতামতটি দুটি পন্থায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রবক্তাদের পর্যালোচনা করার মাধ্যমে তিনি এ কাজটি করেছেন। এক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান এনলাইটমেন্ট ইতিহাসের সঙ্গে যারা জড়িত—বিশেষত হবস, কান্ট এবং ফরাসি বস্তুবাদী অন্যান্য দার্শনিকদের তিনি পর্যালোচনা করেছেন—তাদের দর্শনগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপিয়ান এই সব পুরোনো ভাবনাকে তিনি আঠারো শতকের সুইস দার্শনিক রুশোর চিন্তাধারার পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। তোদোরভ দাবি করেন—রুশো মানুষ সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন, তা কেবল ইউরো-আমেরিকান চিন্তাবিদদের তুলনায় ব্যতিক্রমই শুধু নয়; বরং রীতিমতো বৈপ্লবিক চিন্তাধারা।

তোদোরভ মনে করেন, ইউরোপিয়ানদের মধ্যে রুশো হলেন প্রথম দার্শনিক, যিনি অনুধাবন করেছেন—মানুষের অপরের সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে।[৭]

বলতে দ্বিধা নেই—রুশো যে চিন্তাধারাগুলো দিয়ে গেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তোদোরভের মতে—ইউরোপিয়ান বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাগুলো মানুষকে অসামাজিক হিসেবে গণ্য করেছে। কারণ, তাদের চোখে মানুষ এমন পরিপূর্ণভাবে সৃষ্ট যে, তার অন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না। অন্যদিকে, পুরোপুরি বিপরীত অবস্থান নিয়ে রুশো বলে গেছেন—

> 'মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে সহজাতভাবে এত বেশি অপর্যাপ্ততা রয়েছে যে, আমাদের প্রত্যেকেরই অপরের সাহায্য প্রয়োজন।'[৮]

তোদোরভ আরও দাবি করেন—প্রাথমিক ইউরোপীয় চিন্তাধারা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের অসম্পূর্ণতা এবং অপর্যাপ্ততাকে অস্বীকার করে। ইউরোপীয় ধ্যানধারণা অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়েই সহজাতভাবে পরিপূর্ণ। এই কারণে, ইউরোপীয় নৈতিক চিন্তাধারা ব্যক্তিবিশেষকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে গড়ে তুলেছে।

তোদোরভ আরও বলেন—ইউরোপীয় চিন্তাধারায় সমাজবিরোধী বৈশিষ্ট্যগুলোকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই ধারার সূচনা হয়েছে একেবারে প্রাচীন আমলে; যখন আমরা স্টয়েক্সের কাজগুলোকে জানতে পারি। স্টয়েক্স মনে করতেন—অন্যদের নিয়ে চিন্তা করা কিংবা তাদের পছন্দ-অপছন্দ বুঝে চলা রীতিমতো একটা বোঝা এবং মানুষকে এই দায় থেকে মুক্ত করতেই হবে। তার এই চিন্তাধারার আলোকেই পরবর্তী সময়ে সেইন্ট অগাস্টিন ক্রিশ্চিয়ানিটির নতুন ধারা প্রবর্তন করেন—যেখানে 'কনফেশনের' একটি প্রথা চালু হয়। এই কনফেশন প্রথার মাধ্যমে অগাস্টিন মোটামুটি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার মতো সুযোগ করে দেন।

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে তৎকালীন চিন্তাবিদরা এই ভাবনায় এসে উপনীত হন—সমাজ ও নৈতিকতা মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তির সাথে সাংঘর্ষিক। তাই জনগোষ্ঠীর নিয়ম-নীতি ও জীবনপদ্ধতি ব্যক্তি বিশেষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে তা ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে যায়। তোদোরভ মনে করেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ধারণাটি আজকের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব।[৯]

এই তত্ত্বগুলোর ভিত্তিতে এমন কিছু ধারণা গ্রহণ করা হয়, যা ইউরোপিয়ান এবং ইউরো-আমেরিকান আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে কেবল মানবিক বৈশিষ্ট্যই নয়; বরং মানব জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে এই লক্ষ্য পূরণে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রণোদনা দেওয়া হয়। স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে এই ধরনের অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করার ফলে পরবর্তী সময়ের মানুষও নিজেকে অন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং নিজের মতো করে জীবনযাপনের একটা রীতি বের করে নেয়।

অন্যদিকে, রুশোর চিন্তাধারাগুলোকে তোদোরভ অনেক ক্ষেত্রেই বিবেচনায় নেননি। এর ফলে পশ্চিমাজগৎ মানুষের একটি বিরাট সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ হারিয়েছে। যদি আমরা একই সঙ্গে তোদোরভ এবং বোর্দিও পড়তে পারি, তাহলে আমরা হয়তো এমন একটি কৌশলের কথা উপলব্ধি করতে পারব, যার ভিত্তিতে অধিকাংশ ইউরোপীয় ও আমেরিকান আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেকেলে চিন্তাধারাকে বর্জন করতে পেরেছে।

এটা তোদোরভের অভিমত। আর আমিও এই বিষয়টিকেই কাজে লাগাতে চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অধিকাংশ আইনি প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বের চর্চা করে। ফলে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া বা পর্যালোচনা করা খুব সহজ কাজ নয়। আর আমি যেহেতু তোদোরভকে প্রাথমিক মন্তব্য হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম, তাই এর খুব গভীরে যাওয়া আমার পক্ষে সমীচীন হবে না। পাশাপাশি একজন চিন্তাবিদ হিসেবে মালিনোভস্কির মতামতকেও আমি বিবেচনায় নিয়েছি। মালিনোভস্কি মতামত দিয়েছেন—

> 'একজন মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের মনকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে পারে না। এই বিষয়গুলোকে পাশাপাশি রেখে আমরা ধারণা করতে পারি—কীভাবে সমাজকে এই ধরনের তত্ত্ব ও চিন্তাধারা প্রভাবিত করে।'[১০]

এক্ষেত্রে আমি আরেকজন ফরাসি বুদ্ধিজীবী মিশেল ফুকোর কথা বলতে চাই, যিনি পশ্চিমা ফৌজদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর বিস্তর গবেষণা করেছেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশমেন্ট' নামে একটি মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করেছেন। এই গবেষণায় পশ্চিমা তথ্যগুলোর মৌলিক পাঠ এবং বিচারিক শাস্তির প্রয়োগ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বোর্দিও'র মতো ফুকোপাঠও খুব সহজ নয়। ফুকোর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ও সূক্ষ্ম। আমি এখানে ফুকোর বইয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব না। শুধু এটুকুই বলব—সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে ফুকো যা

বলেছেন, তার অনেকটুকুই তোদোরভের ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। ফুকো পশ্চিমা ফৌজদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশেই স্থাপন করেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ ধরনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কৌশলগতভাবে ব্যক্তির ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও ধারাবাহিক উন্নতি প্রসঙ্গে যে চটকদার কথা শোনা যায়, তার আড়ালে ফুকো ভিন্নতর একটি প্রচেষ্টাকে শনাক্ত করেছেন—যার মাধ্যমে মানবিক ব্যক্তিত্বের ওপর আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমা সমাজে শাস্তি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কারাগারের যে আধিপত্য দেখা যায়, তাকে বর্বরতা থেকে মানবতাবাদে উন্নত হওয়ার প্রচেষ্টার সাথে মেলানো যাবে না; বরং এটাকে নিছক একটা পরিবর্তন অথবা নতুন করে লক্ষ্য নির্ধারণ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। কারাগারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানুষের শারীরিক অবয়বের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করার চর্চাকে পালটে দিয়ে এর পরিবর্তে মানুষের আত্মার ওপর কিছু বিধান চাপিয়ে দেওয়ার অনুশীলন করা হয়।[১১]

এখানে আত্মা বলতে যা বোঝায়, তা খ্রিষ্টীয় সমাজের প্রচলিত আত্মার ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। আবার রুহ বা আত্মাসংক্রান্ত অতীতে যে ধারণাগুলো ছিল, ফুকোর মতামত তার সাথেও মিল খায় না। ফুকো তার তত্ত্বের মাধ্যমে আত্মার যে ধারণা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে আমরা মানবীয় ব্যক্তিত্বের সেই বিষয়গুলোকেই বুঝতে পারি—যা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের বাইরে থাকে। পশ্চিমা সমাজে কারাগারের আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছে। আর ফুকোর মতে, এই আধিপত্য হলো—আধুনিক রাষ্ট্র-কাঠামোর অধীনে থেকেই সমাজের আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নতুন উপায়।

> 'জেল বা কারাগার আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য একটি প্রতিষ্ঠান। জেলখানা ব্যক্তির সব ধরনের বিষয়াদির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বন্দির শারীরিক প্রশিক্ষণ, তার কর্মস্পৃহা, তার নিত্যদিনের আচরণ ও কার্যক্রম, তার নৈতিকবোধ, মানসিকতা—সব কিছুর ওপর জেলজীবনের প্রভাব থাকে। যেকোনো স্কুল কিংবা সেনাবাহিনীর ওয়ার্কশপের তুলনায় জেলজীবন অনেক বেশি শক্তিশালী। কেননা, স্কুল বা ওয়ার্কশপ একজন ব্যক্তিকে তৈরি করে আর কারাগার ব্যক্তিত্ব গঠনের গোটা প্রক্রিয়াকেই আমূল বদলে দেয়।

> কারাগারের ভেতরে একজন বন্দি নিজের সাথে বোঝাপড়া করেই সময় কাটায়। কারাগারের নিঃসঙ্গতায় আবেগ আর স্মৃতিগুলোই তার সঙ্গী। তাই বন্দি ব্যক্তি তখন একা একাই নিজের বিবেকের সাথে আপন মনে কথা বলে। নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেয়। আবার এমনও হয়—এই বোঝাপড়ার ভেতর দিয়েই বন্দির চেতনায় নতুন করে এক পুনর্জাগরণও ঘটে যায়, হয়তো তার অজান্তেই। বন্দিদশায় তার ভেতর এতসব অনুভূতি খেলা করে, যা হয়তো স্বাভাবিকভাবে তার মনে বা চিন্তার জগতে আসতই না। এই অনুভূতিগুলোর অনেকগুলোই তার মন থেকে কখনোই হয়তো আর মুছে যায় না, মুছে ফেলা সম্ভবও হয় না।
>
> কারাবাস মূলত ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু বন্দিজীবনের এত বাধ্যবাধকতা ও কর্তৃপক্ষের নজরদারি সত্ত্বেও বন্দির সাথে নতুন করে অনেকগুলো মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আবার অনেকগুলো সম্পর্ক হয়তো চিরতরে ছিন্নও হয়ে যায়। প্রচণ্ড নজরদারি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা বুঝতে পারে না, আটকাতেও পারে না।[১২]

ফুকো কারাগারকে সংশোধনী কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন—এই কারাগারগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে কারাবন্দিরা পশ্চিমা সমাজের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত সামাজিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে। যখন একজন কারাবন্দি এই সংশোধনী কেন্দ্র থেকে বের হবেন, আশা করা যায়, তিনি ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব অনুযায়ী অসামাজিক বৈশিষ্ট্যের ধারক হয়ে উঠতে পারবেন। ফুকোর মতে—কারাগারের ভেতরে যেভাবে ব্যক্তিত্ব গঠন করা হয়, তাতে একজন ব্যক্তি অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মতো করে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তার নৈতিকবোধও সেভাবেই গড়ে ওঠে। ফলে সেই ব্যক্তি তার অন্যান্য প্রতিবেশী মানুষদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে। আবার একই সঙ্গে সমাজের জন্য নিজেকে কার্যকর হিসেবেও তৈরি করতে পারে।[১৩]

পশ্চিমা সমাজে কারাগারকে ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে যতটুকু সফল মনে করা হয়, ফুকো আবার কারাগারকে ততটাই ব্যর্থ মনে করেন। কেননা তার মতে, এভাবে ব্যক্তিবিশেষকে বন্দি করে রাখায় তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মধ্যে আগের সুস্থজীবনে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসে।[১৪]

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফুকো পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা তোদোরভের ইউরোপীয় ইতিহাসের পর্যালোচনার সাথে অনেকটাই মিলে যায়।

সেইসঙ্গে একজন মানুষের টিকে থাকার জন্য অপর মানুষের সাহায্য দরকার—এই মর্মে রুশো যে দাবি করেছেন, তা-ও সঠিক প্রমাণ হয়। রুশোর মতকে যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে যে চিন্তাধারার আলোকে পশ্চিমা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয়েছে, তা-ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। বিশেষত ফৌজদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতা খুব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়।

যদিও আমি এই বিষয়টি নিয়ে খুব একটা আলোচনা করতে চাই না। তবে বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে দার্শনিক চিন্তাধারা বহন করে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা বরং আমার কাছে বেশি প্রয়োজনীয় মনে হয়। আলোচনার এই পর্যায়ে, ইউরোপ এবং পশ্চিমা চিন্তাধারাকে একটু সরিয়ে রেখে আমি ইসলামি শরিয়াহর দিকে একটু নজর দিতে চাই।

ইসলামি শরিয়াহ নিয়ে কথা বলার আগে এটা পরিষ্কার হওয়া জরুরি—মুসলিম চিন্তাবিদরা আরবি 'শরিয়াহ' শব্দটি দিয়ে মূলত কী বোঝাতে চান? সম্ভবত শাব্দিক অর্থে তারা শরিয়াহর যে ব্যাখ্যা করেন, তার বাইরে গিয়ে শরিয়াহকে বোঝাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

আমি ইসলামি সাহিত্য যতটুকু পড়েছি, তাতে এতটুকু বুঝতে পেরেছি—শরিয়াহ শব্দটির অর্থ বোঝানোর মতো যথাযথ ইংরেজি শব্দ পাওয়া কঠিন। যেমন : প্রচলিতভাবে মনে করা হয়—শরিয়াহ হলো এমন কিছু পবিত্র আইন, যার উৎস কুরআন ও সুন্নাহ।[১৫] অথবা বলা হয়—ইসলামি আইনশাস্ত্র বা ইসলামি ফিকাহ'র একটি তাত্ত্বিক রূপ হলো শরিয়াহ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, শরিয়াহ শব্দটি দিয়ে আরও মৌলিক একটি বিষয় বোঝানো হয়।

মূলত ইসলামিক আইনশাস্ত্র তৈরি হওয়ারও আগে শরিয়াহর উৎপত্তি। এক্ষেত্রে আমি আবার বোর্দিওর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য মনে করি। কেননা, পশ্চিমে শরিয়াহ সম্বন্ধে যে ধ্যানধারণাগুলো আছে, তার থেকে যদি শরিয়াহকে আলাদা করতে হয়, তাহলে আমাদের নতুন করে শব্দভান্ডার খোঁজা প্রয়োজন। শরিয়াহ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা পেতে হলে আমাদের অভ্যস্ততা বা অভ্যাসের বিষয়ে জানতে হবে। বিশেষ করে সামাজিক কাঠামোর আওতায়

মানুষ কীভাবে একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে কিংবা কীভাবে মানুষ স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা শরিয়াহর মূল ব্যাখ্যার সাথে অনেকটুকুই প্রাসঙ্গিক।

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—শরিয়াহ একটি বিস্তৃত অতীতের ধারাবাহিকতা বহন করে। মুসলমান স্কলারেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধারাবাহিক উন্নতি করার মাধ্যমে শরিয়াহকে জন্ম দেননি। কেউ শরিয়াহকে পুনর্জাগরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চাইলেই শরিয়াহ আইন বানাতে পারবেন না, শরিয়াহতে ফিরতে পারবেন না; এমনকী শরিয়াহর আইন বাস্তবায়নও করতে পারবেন না। এ কারণেই বলা হয়েছে—শরিয়াহ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে মুসলিম আইনবিদরা প্রথমত শরিয়াহকে ধারণ করেন; তাদের জীবনযাপন ও অভ্যস্ততায় বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত হোন এবং তারপরে নিজের অবস্থানের জায়গা থেকে মত প্রদান করেন।

শরিয়াহ নিয়ে কথা বলতে গেলে সবার আগে যে প্রশ্নটি সামনে আসবে, তা হলো—বর্তমান বাস্তবতায় মুসলিম আইনবিদরা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করছে, সেভাবেই কি অতীতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজে লাগানো হতো? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরেকটি বড়ো প্রশ্নও আসে। আর তা হলো—বর্তমান বাস্তবতায় শরিয়াহ নিয়ে কতটুকু কথা বলার বা শরিয়াহর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়ন করার কতটুকু সুযোগ আছে?

আমি এখানে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আগ্রহী নই; অন্তত এই অধ্যায়ে তো নয়ই। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—মুসলিম আইনবিদরা বছরের পর বছর, এমনকী শতাব্দীর পর শতাব্দী সময় নিয়ে—একটি আইনি কাঠামো প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এটা তারা করেছেন মানবিক অভ্যাসগুলোর ওপর ভিত্তি করে। এই অভ্যাস বা অভ্যস্ততার চর্চা করতে গিয়ে আমরা শরিয়াহ সম্বন্ধে হয়তো কিছুটা ধারণা পেয়ে যাব। আর সেক্ষেত্রে ওপরের প্রশ্নগুলো আমাদের জন্য খুব একটা বাধা হয়েও দাঁড়াবে না।

মানবিক অভ্যস্ততার ভিত্তিতে যেভাবে ইসলামি চিন্তাবিদরা শরিয়াহর একটি আইনি কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে ইংরেজিতে তেমন কোনো ভালো লেখা পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ক্যারেন আর্মস্ট্রংকে কিছুটা ব্যতিক্রম বলতেই হবে। ইসলাম কীভাবে সময় এবং স্থানকে ধারণ করে চলে, সেই ব্যাপারে

ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার বিখ্যাত বই *ইসলাম : এ শর্ট হিস্ট্রি*র ভূমিকায় চমৎকার কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন—

> 'ইসলামের কাঠামোটিই এমনভাবে তৈরি করা—মুসলমানরা ইতিহাসকে জানার, বোঝার ও অনুধাবন করার জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন তাদের ওপরে ঐতিহাসিক একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। আর সেই দায়িত্বটি হলো—একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও আইনসংগত সমাজ কাঠামো নির্মাণ করা। এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ, যেখানে সকল সদস্য এমনকী সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটিকেও পর্যাপ্ত সম্মান ও অধিকার প্রদান করা হবে।
>
> মুসলমানরা বিশ্বাস করে, এই ধরনের একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তারা ঐশ্বরিক নিয়ামত ও পুরস্কার পাবেন। কেননা, স্বয়ং আল্লাহই তাদের এই ধরনের একটা দায়িত্ব প্রদান করেছেন। মুসলমানরা ইতিহাস থেকে যে শিক্ষা পায়, তাতে এই সত্যই পরিষ্কার হয়—রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়; বরং ধর্মেরই অপরিহার্য একটি অংশ।
>
> একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। নিঃসন্দেহে অন্য অনেক ধর্মের ইতিহাসের মতো মুসলমানদের ইতিহাসেও উত্থান-পতনের ঘটনা এবং নানা ধরনের ব্যর্থতাও রয়েছে। তবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সত্য হলো—প্রতিটি ব্যর্থতার পর মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং সফলতার পানে যাত্রা করেছে।'[১৬]

ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের উপর্যুক্ত প্যারাতে মানুষ সম্পর্কে যে কথাগুলো এসেছে, তা তোদোরভের ইউরোপীয় দর্শন তত্ত্বের মানবিক ব্যাখ্যার পুরোপুরি বিপরীত। অপর মানুষদের নিয়ে চলার বিষয়টিকে তোদোরভ বোঝা মনে করলেও ইসলামের দর্শন অনুযায়ী এভাবে চিন্তা করার কোনো সুযোগই নেই; বরং আল্লাহর প্রতি মুসলমানদের দায়িত্ব পালনের মৌলিক উপায়ই হলো—অপর মানুষের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করা। ইসলামের যাবতীয় নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই আবর্তিত হয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের মতো করে জীবনযাপন করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই।

আর্মস্ট্রং ইসলাম ও মুসলিম সম্বন্ধে বিস্তর পড়াশোনা করে মুসলমানদের এই মিশন বা দায়িত্বটি অনুধাবন করতে পেরেছেন। তবে বাস্তবতা হলো—মুসলমানদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল কুরআনে আরবি অক্ষর হামজা, নুন এবং সিন তথা 'আন-নাস' শব্দটি দিয়ে মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়; কুরআনে সেই মানুষগুলোকে প্রশংসা করা হয়েছে—যারা অপরকে নিয়ে ভাবে, অপরের জন্য কাজ করে এবং সকলের সাথে মিলেমিশে চলে। আল কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলামের যে মৌলিক নীতিটি সহজেই বোঝা যায়, তা হলো—প্রতিটি মানুষেরই অপরের সহযোগিতার প্রয়োজন।

পশ্চিমা ব্যক্তিতন্ত্রের মতো ইসলামের সামাজিক দর্শনও বেশ কিছু বিচারিক উপকরণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। শরিয়াহর ন্যায়বিচারের মূল নীতিমালা মানুষের পারস্পরিক সম্মানবোধের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। এ. আর. দয়ি এ প্রসঙ্গে বলেন—

> 'ইসলামে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেখানে বেশ কিছু সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে প্রতিটি মানুষের জন্য সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ইসলামে বলা হয়েছে, প্রতিটি মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর একজন খলিফা। তাই এখানে একক কোনো মানুষের শীর্ষ অবস্থান নিশ্চিত করা হয়নি; বরং সমাজের প্রতিটা মানুষের সম্মানকেই সুনিশ্চিত করা হয়েছে। আর যখনই একজন মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান দেওয়া হবে, তখন তার প্রতিদান হিসেবে আবার সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে তাকে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। যাতে সকলে মিলে সমাজের সবার সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি নিশ্চিত করা যায়।'[১৭]

শরিয়াহ সম্বন্ধে মুসলিম আইনবিদ ও ইসলামি চিন্তাবিদদের অসংখ্য লেখনী পাওয়া যায়। এ রকম অনেক লেখনী বা মন্তব্যকেই পশ্চিমাদের কাছে অস্পষ্ট, অবাস্তব এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে; তাই বলে শরিয়াহর গুরুত্ব কখনোই কমে যাবে না। কেননা, মানবিক অভ্যস্ততা ও সহজাত আচরণকে বিবেচনায় নিয়েই শরিয়াহ একগুচ্ছ নীতিমালা নির্ধারণ করেছে—যা পশ্চিমাদের 'ব্ল্যাক লেটার ল'-এর মতোই কার্যকর।

খেয়াল করে দেখবেন, এ.আর. দয়ি উপর্যুক্ত প্যারায় সামাজিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মানুষের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন; আইন প্রয়োগ করে

কিংবা ফৌজদারি কাঠামো দিয়ে নয়। এইখানে এসে পশ্চিমা চিন্তাধারার সাথে ইসলামি চিন্তাধারার ব্যাপক পার্থক্য সূচিত হয়। তার মানে এই নয়—ইসলাম বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম গুরুত্ব দিয়েছে; বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও অনেক বেশি সক্রিয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আর পাশাপাশি সহানুভূতিশীল একটি সমাজ-কাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে ইসলাম মানবিক সমস্যাগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করেছে।

দয়ির মতে, শরিয়াহ এমন একটি বিধান প্রবর্তন করেছে—যেখানে মানুষের জন্ম, গোত্র, সম্পদ, ভাষা বা অন্য কোনো বিষয়ে বিভাজন করার সুযোগ নেই। কেবল সমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেই মানুষের সম্মানহানি ঘটতে পারে। আর ইসলামি শরিয়াহ প্রবর্তিত এই ধরনের একটি সামাজিক কাঠামো সমাজবিজ্ঞান তো বটেই; এমনকী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক।

> 'এখানে উল্লেখ্য, শরিয়াহ মানুষের স্বাধীনতা থেকে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। একটি মুসলিম রাষ্ট্রে যতসংখ্যক মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক থাকেন, তাদের সকলের দায়িত্ব হলো—বিদ্যমান কোনো সুবিধা কিংবা উৎপাদনশীল জমিকে বিনষ্ট করে নিজের ফায়দা হাসিল না করা। মনে রাখতে হবে, ইসলামে মানুষ শুধু একটি অর্থনৈতিক পণ্য নয়; বরং প্রতিটি মানুষেরই শালীনভাবে এবং সম্মানের সাথে জীবনযাপনের একই রকম অধিকার রয়েছে। আর এই অধিকারটি অর্থনৈতিক যেকোনো স্বাধীনতার থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী।'[১৮]

এখানে এই বাস্তবতাও বিবেচনায় রাখতে হবে—ইসলামে এই বিষয়গুলোকে আইনি কাঠামোর ভেতর দিয়ে যেভাবে পরিচালনা করেছে, একইভাবে আধুনিক পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতেও এ ধরনের কিছু আইন কার্যকর রয়েছে। দয়ি শুধু এটুকুই বলতে চেয়েছেন—শরিয়াহ যেভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছে, তাতে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বা বিচারের নামে প্রহসনের সুযোগ কম। তিনি বলেন—

> 'ইসলামের প্রতিটি আইনি, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেপথ্যে একধরনের ঐশ্বরিক নির্দেশনা কাজ করে—যা প্রতিটি মুসলমানকে সর্বাবস্থায় অনুসরণ করতে হয়। একজন প্রকৃত মুসলমান তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে কখনোই আইনে পরিণত করতে পারেন না।

মুসলমানদের ওপর আল্লাহর কিছু সংবিধিবদ্ধ নীতিমালা (হুদুদ আল্লাহ) অর্পণ করা আছে, যা মুসলমানদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সুবিধাবাদী মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।'

দয়ি দাবি করেন, আল্লাহর এই সংবিধিবদ্ধ নীতিমালাগুলোর দুটো দিক আছে। একটি হালাল বা বৈধ, আর অপরটি হারাম বা অবৈধ। হালাল-হারামের এই বিষয়গুলো কুরআনের আয়াতে এবং পরবর্তী সময়ে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের মধ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। হালাল-হারামের এই বিধানগুলোই মুসলমান সমাজের জন্য কতগুলো সীমানা নির্ধারণ করে দেয়—একজন মুসলমান কতটুকু পর্যন্ত করতে পারবেন, আর কোথায় গিয়ে তিনি থেমে যাবেন। বৈধ সীমানার ভেতরে মুসলমানেরা ঈমানের চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করতে পারবে এবং একই সঙ্গে নৈতিক দায়বদ্ধতাও পালন করতে পারবে।[১৯]

এই প্রসঙ্গে ইসলামের ইতিহাস থেকে রেফারেন্স হিসেবে আমি কোনো বিচারিক প্রতিষ্ঠানের কথা আলাদা করে বলতে চাই না। কেননা, দেখা গেছে—অতীতে এমন অনেক বিচারিক প্রতিষ্ঠান শরিয়াহর ভিত্তিতে চালু হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু সমস্যার মধ্যেও পড়ে যায়। একই সঙ্গে, আমি ফিকহের সমৃদ্ধ ইতিহাসকেও অস্বীকার করতে চাই না। বিভিন্ন আলিম ও ফকিহদের কাজগুলোকেও আমি সম্মান জানাতে চাই। এমনকী সামান্য একজন গ্রাম্য কাজির মতামতের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা আছে।

প্রসঙ্গত, আমি বারবার ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের ওই মন্তব্যকেই সামনে আনতে চাই, যেখানে তিনি বলেছেন—'মুসলমানরা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং অন্য সকল ধর্মের ইতিহাসের মতোই মুসলমানদের ইতিহাসেও পতনের নানা অধ্যায় থাকলেও মুসলমানরা বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে।' এখানে এ-ও প্রণিধানযোগ্য—কোনো বিচাররিক সিদ্ধান্তটি শরিয়াহসম্মত হয়েছে কি না, তা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সব সময়ই কম-বেশি বিতর্ক ছিল। কেননা, প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সংকট এত বেশি এবং নিত্য-নতুন এতসব প্রশ্ন সামনে চলে আসছে, যার ব্যাপারে শরিয়াহর সুনির্দিষ্ট মতামত পাওয়া যায় না।

এটা বলা এখানে খুব সমীচীন হবে না—বর্তমান পৃথিবীতে এবং ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজগুলোতে কার্যকর বিচারিক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অনেকটা ব্যর্থতা রয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সমাজে একগুচ্ছ প্রণোদনার অস্তিত্ব আছে, যেগুলোকে অমুসলিম বা পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রচলিত আইনি উপকরণ থেকে আলাদা করা যায়। বিশেষ করে, উভয় সমাজব্যবস্থায় মানুষের ওপর শাস্তি আরোপের বিষয়টি নিয়েই অনেকখানি পার্থক্য দেখা যায়।

শরিয়াহ যেভাবে মানুষকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলে, পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা ঠিক সেভাবে চিন্তা করে না। যেমন : আমরা যদি ফুকোর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চিন্তা করি, তাহলে বলা যায়—পশ্চিমা ব্যক্তিবাদ তাদের আইনি ও বিচারিক বিষয়াবলিকে কারাগার পদ্ধতির ভেতর দিয়ে আরোপ করতে চায়। ব্যক্তিতন্ত্রকে অনেক ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের থেকেও বেশি সুবিধা দেওয়া হয়। অনেক সময় ব্যক্তিকে রক্ষা করার স্বার্থে আস্ত একটা গ্রামকেও ধ্বংস করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যে সামষ্টিকতা রয়েছে (শরিয়াহ বা ফিকাহ যেভাবেই চিন্তা করি না কেন), তা এই ধরনের ধ্বংসাত্মক চিন্তা অনুমোদন করে না। কারাবরণের বিষয়টা ইসলামিক পদ্ধতিতে নেই যে, তা নয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমসমাজ কখনোই পশ্চিমাদের মতো করে কারাগারকে মানুষকে সভ্য ও মানবিক বানানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়নি।

এটা ভুল হবে, যদি আমি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করি। বোর্দিও যাকে অভ্যাস বা অভ্যস্ততা হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, তা নৃতাত্ত্বিক অনুঘটক হিসেবে মুসলমানদের কাছে আগে থেকেই পরিচিত। মুসলমানরা এই অভ্যস্ততার বিষয়টিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুয়ামিলাত হিসেবে আখ্যায়িত করে। ইসলাম সব সময় একটি ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সামষ্টিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে; ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ও অবদানকে কখনোই একমাত্র অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে না।[২০]

এই ধরনের আলোচনা মুসলিম ও পশ্চিমা ব্যক্তিতন্ত্রের মধ্যে বৈপরীত্যগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। সম্প্রতি মার্কিন দার্শনিক রিচার্ড অ্যালড্রিজ উইটেগনেসেনের শেষ দিকের কাজগুলোর ওপর গবেষণা করতে গিয়ে এই ধরনের বৈপরীত্যের সন্ধান পেয়েছেন। ফলে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, আগে কোনটার পরিবর্তন জরুরি—মানুষের চরিত্রের, নাকি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর? ব্যক্তি চরিত্রের এবং সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তন পরস্পরকে

প্রভাবিত করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতায় পরিণত হওয়া অপর কোনো মানুষকে সরাসরি শিক্ষিত ও উন্নত করার চেষ্টা করে, তাহলে সে ব্যর্থ হবে। আবার কেউ যদি মানুষের চরিত্রকে ধারণ করে আছে—এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরাসরি বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে-ও ব্যর্থ হবে। রাজনৈতিক ঘরানায় যত ধরনের পরিবর্তন হবে, তার একমাত্র উপকরণ ও নিয়ামক হওয়া উচিত মানবিক চরিত্রের উন্নয়ন। কিন্তু প্রশ্ন হলো—বর্তমানে যেভাবে সংবিধানগুলো বর্বর হয়ে উঠছে, তাতে চরিত্রের উন্নয়ন কতটা সম্ভব?[২১]

সাধারণভাবে আমি মনে করি, চিন্তাশীল মুসলিম ও অমুসলিম—উভয়েই যদি সংকট নিরসনে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে আগ্রহী হয়, তাহলে তারা খুব সহজেই এই গোলকধাঁধার বিষয়ে তারা একমত হয়ে যেতে পারবে। ঐতিহাসিকভাবে শরিয়াহর আলোকে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৈরি করার যে মুসলিম ইতিহাস মুসলমানরা, তখন তা অনুভব করবে। শুধু তা-ই নয়; সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেও মুসলমানরা তখন ঐশ্বরিক নির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করবে।

তবে, পশ্চিমা অমুসলমানরা এভাবে চিন্তা করবে না। তারা বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপায়েই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। তারা বৈরাগ্যবাদ থেকে বাঁচার জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে উপকরণ নেওয়ার চেষ্টা করবে। তবে মুসলমানদের এভাবে বিবেচনা করার উপায় নেই।

এল.সি. ব্রাউন সম্প্রতি একটি আলোচনায় বলেছেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেকগুলো মুসলিম দেশেই অনেক মুসলমানের মাঝেই রাজনৈতিক বৈরাগ্যবাদ চর্চার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।[২২] শরিয়াহর এই বিষয়টিকে মুসলমানরা কীভাবে গ্রহণ করবেন, সেটা নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। তবে দয়ি কিংবা আর্মস্ট্রং-এর মতো ইতিহাসবিদ, বিভিন্ন ফরাসি দার্শনিকদের মতামতগুলো নিঃসন্দেহে পাঠকদের বিষয়টির আরও গভীরে যাওয়ার এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতাগুলোকে আরও বেশি করে জানার খোরাক জোগাবে। সেইসঙ্গে, মানুষের চিরায়ত অভ্যাস এবং সেই অভ্যস্ততাকে কেন্দ্র করে যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে পর্যালোচনা করতেও পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করবে।

তথ্যসূত্র :

১. Tzvetan Todorov, *Life in Common : An Essay in General Anthropology*, trans. Katherine Golson & Lucy Golson (Lincoln, University of Nebraska Press, 2001)

২. একই তথ্যসূত্র।

৩. *Richard Terdiman, The Hastings Law Journal* (July 1987), 38 (5) m pp. 805-853

৪. একই তথ্যসূত্র।

৫. Richard Terdiman, ÔTranslator's introductionÕ to Pierre Bourdieu, ÔThe Force of Law.'

৬. A John Simmons, *The Lockean Theory of Rights (Princeton,* NJ : Princeton University Press, 1992), p-14

৭. Todorov, Life in Common

৮. একই তথ্যসূত্র

৯. একই তথ্যসূত্র

১০. Norman F. Cantor, *Imagining the Law: Common Law and the Foundations of the American Legal System* (New York: Harper Collins, 1997).

১১. Michel Foucault, *Discipline & Punish: The Birth of Prison,* trans. Alan Sheridan (New York: Vintage Books, 1995), p.22-24, 293-308

১২. একই তথ্যসূত্র

১৩. একই তথ্যসূত্র

১৪. একই তথ্যসূত্র

১৫. Karen Armstrong, *Islam; A Short History* (New York: The Modern Library, 2000), p. 202

১৬. একই তথ্যসূত্র

১৭. Abdur Rahman I. Doi, *Shariah: The Islamic Law* (London: Ta Ha Publishers, 1984)

১৮. একই তথ্যসূত্র

১৯. একই তথ্যসূত্র

২০. Muhammad Asad, *This Law of Ours and Others Essays* (Gibraltar: Dar al- Andalus, 1987), pp-34-37

২১. Richard Eldridge, *Leading a Human Life:* Wittgenstein, Internationality and Romanticism (Chicago: University of Chicago Press, 1997), p. 73

২২. L. Carl Brown, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics* (New York: Columbia University Press, 2000)

আধুনিক বিজ্ঞানের শিকড় মধ্যপ্রাচ্যে

দিলনেওয়াজ এ. সিদ্দিকি

জনশ্রুতি আছে, সূর্যের নিচেই কোনো কিছু এমন নেই—যা একেবারেই নতুন। আদিকাল হতে মানবজাতি তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই মূলত জ্ঞানলাভ করেছে। পরবর্তী সময়ে সেই জ্ঞানের আলোকে সমসাময়িক চাহিদার ভিত্তিতে তারা কাজ করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে তা হস্তান্তর করেছে। মানুষের জ্ঞান এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্মে রূপান্তরিত ও হস্তান্তর হয়েছে।

জ্ঞানের এই রূপান্তরের পাশাপাশি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় অথবা এক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন আরেকটি সংস্কৃতিতে সব সময়ই জ্ঞান ও চিন্তার আদান-প্রদান ও হস্তান্তর হয়েছে। আনুমানিক সাত হাজার বছর আগে শাত আল আরব, নীলনদ এবং ইন্দুস নদীর অববাহিকায় যে মানবসভ্যতার সূচনা হয়েছিল, কালক্রমে তা আজকের এই বাস্তবতায় এসে পৌঁছেছে।

মানুষের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং লাভজনক কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। গ্রিক-রোমান সভ্যতার আগে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত খালিদিয়া, ব্যাবিলন, ভারত এবং চৈনিক সভ্যতার দার্শনিকরা মানবসভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের আওতায় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রিক সভ্যতা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়। অতঃপর রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে গ্রিক সভ্যতা তার পূর্বের ঐতিহ্য অর্থাৎ সৃষ্টিশীলতা, নতুনত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এমনও বলা যায়—পরবর্তী সময়ে গ্রিক সভ্যতা একধরনের ঘুমন্ত অবস্থার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। গ্রিক সভ্যতার সোনালি যুগের অনবদ্য সব আবিষ্কারগুলোকে নতুন করে আবার সামনে নিয়ে আসে মুসলমানরাই।

বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তার আদান-প্রদান করার মূল দায়িত্বটি মূলত সমসাময়িক ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর ওপরই থাকে। ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমাজগৎ তার জ্ঞানগুলোকে সমন্বয়, উন্নতকরণ এবং ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমাদের অবদানটুকু দীর্ঘ সময় দৃশ্যমান ছিল না।

অন্য অনেক সংস্কৃতির মতোই ইউরোপেও সমাজবিজ্ঞানের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, তার সাথে অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যেমন মিল ছিল, ঠিক তেমনি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বেশ কিছু পার্থক্যও ছিল। এই পার্থক্যগুলো জিইয়ে রাখা হয়েছিল অনেকটা যেন সচেতনভাবেই। এর একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল—মানবসভ্যতার বিকাশে ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর অবদানকে লুকিয়ে রাখা। আর এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণেই ইউরোপে সহজাত আরেকটি চেতনার জাগরণ ঘটে, তা হলো—বিশ্বকে সভ্য করার দায় একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের। এই বর্ণবাদী মানসিকতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা সব ধরনের প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পদের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

যুক্তিপূর্ণ আলোচনা

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে—আজকের সময়ে যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এতটাই পিছিয়ে আছে, সেই জাতির ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভটা কী? কিংবা আজকে প্রতিনিয়ত যখন আমি বিপর্যয়ের মাঝে পার করছি, তখন আমার পূর্বপুরুষরা রাজা-বাদশাহ ছিল—এই সব অনুভূতি দিয়েই-বা কী উপকার? এর উত্তরে আমি বলতে চাই—এক বা একাধিক কারণে আমাদের বারবার অতীত ইতিহাসের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।

বর্তমান পৃথিবী প্রধানত তিনটি জনপ্রিয় ধারা অবলোকন করছে। ১. তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিপ্লব ২. বিশ্বায়ন এবং ৩. প্রাইভেটাইজেশন বা ব্যক্তিগতকরণ। প্রথম যে ধারার কথাটি বললাম অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব, তার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির নানা মানুষ একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছে। পরস্পরের সাথে মতবিনিময় করার সুযোগ পেয়েছে। সেইসঙ্গে অনবদ্য একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তির তথ্য ও জ্ঞানের কাছাকাছি যাওয়ার। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন জাতি-রাষ্ট্রগুলোকে পরস্পরের প্রতি আন্তঃনির্ভরশীল করে তুলেছে। ফলে একদিকে যেমন জাতি-রাষ্ট্রগুলো সমৃদ্ধ হয়েছে, অন্যদিকে সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করার একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এতে এমন এক ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে, যা মানব ইতিহাসে এর আগে আর কখনোই দেখা যায়নি।

এই সংঘাতময় সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের সবার আগে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর রেখে যাওয়া নীতি 'বিভাজন করো, তারপর জয় করে নাও আর এরপর শাসন করো অর্থাৎ ডিভাইড, কনকুয়ের অ্যান্ড রুল'-সংক্রান্ত নীতিমালাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সভ্যতার সংঘাত (Clash of civilization)-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনাকে ছুড়ে ফেলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন—সভ্যতাগুলোর মধ্যে নিয়মিত সংলাপ এবং প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক উপলব্ধির চর্চা। আর তা করতে হলে নৈতিকতার চর্চার পাশাপাশি শিক্ষাগত উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করা জরুরি। বিশেষ করে পশ্চিমা শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উৎসগুলো কী, সে সম্পর্কে ধারণা রাখা খুবই জরুরি।

পশ্চিমাদের জন্য বৈশ্বিক বাণিজ্য খাতের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার সাথে খাপ খাওয়ানো একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ডারউইনের চিন্তাধারাভিত্তিক আধিপত্যবাদী নীতির আলোকে যে নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থান হয়েছে, তাকে এখন সময়ের তাগিদেই সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতা চর্চা করার মাধ্যমেই সভ্য হতে হবে। একটি টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের মিডিয়াগুলোকেও দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে নতুন ধরনের সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানকে। গতানুগতিক যৌনতা, সহিংসতা এবং ইন্দ্রিয়জাত কামুকতা উপস্থাপনের বদলে যৌক্তিক এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চা করতে হবে।

অন্যদিকে, মুসলমানদের আত্ম–অহংকারকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের সফলতা ও দুর্বলতাকে অনুধাবন করার শক্তি অর্জন করা জরুরি। অতীতে যা অর্জিত হয়েছিল, তার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা, একই সঙ্গে বর্তমান সময়ের দুর্দশা তাকেও সততার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। তাহলেই মুসলমানরা নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করতে পারবে। সেইসঙ্গে মুসলমানরা তখন একটি সুন্দর আগামীর জন্য আত্মবিশ্বাসের সাথে বাস্তব সম্মত পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে পারবে।

সেইসঙ্গে মুসলমানদের তাদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নিজেদের প্রকৃত গল্পকে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করতে হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়— মুসলমানরা তাদের অজ্ঞতা, অহংকার এবং ইসলামবিরোধী শক্তির পাতানো লোভ-লালসা আর ধর্মান্ধতার খপ্পরে পড়ে যাওয়ায় নিজেদের ইতিহাসকে জানতে পারেনি; বরং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের গল্পগুলোকেই বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। তাই সব ধরনের রক্ষণশীলতা পরিহার করে এবং রাখঢাক না রেখে মুসলমানদের বিদ্যমান সভ্যতাগুলোকে চেনার, জানার ও বোঝার মধ্য দিয়ে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হবে।

বিজ্ঞানের উত্থানে অবদান

বিজ্ঞানের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো—বিজ্ঞান সব সময় চলমান ও ক্রমবর্ধমান গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ যেকোনো জাতি মূলত তিনটি স্তর পার হয়ে আজকের জায়গায় এসেছে। এগুলো হলো—অনুবাদ, সমন্বয় এবং অবদান।[১] এই বিষয়গুলো আবার মানবসভ্যতার ইতঃপূর্বে উল্লেখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয়েছে—উদ্ভাবন, সৃষ্টি এবং জ্ঞানের রূপান্তর। উন্নয়নের এই স্তরগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধানটি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান কাঠামো এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে তাদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

তুলনামূলক পর্যালোচনায় বলা যায়, কোনো একটি সভ্যতায় একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে যতটা কম সময় লাগে, মানব উন্নয়নে তাদের অবদান ততটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। আল কুরআন নাজিল হওয়ার আগে মানবসভ্যতার যে অবস্থা ছিল, আর নাজিল হওয়ার পর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে, তা যদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়—তাহলেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে।

তৃতীয় জেমস বার্ক তার বিখ্যাত বই, *The Day the Universe Changed* গ্রন্থে[২] বলেন—কুরআন নাজিল হওয়ার আগে প্রকৃতির ব্যাপারে মানুষের যে অনুভূতি তা ছিল ভয়, উপাসনা এবং ভক্তিকেন্দ্রিক। প্রকৃতির নানা সৃষ্টি; বিশেষ করে ভয়ংকর প্রাণিগুলোকে মানুষ ভয় পেত এবং সেই ভয়ের জায়গা থেকেই মানুষেরা সেই প্রাণিগুলোকে উপাসনা করত—যাতে এই ভয়ংকর প্রাণিগুলো তাদের ওপর রুষ্ট না হয় এবং কোনো ক্ষতি না করে। আবার এমনও জানা যায়, মানুষ তখন প্রকৃতির এমন কিছু উপাদানের উপাসনা করত, যেগুলো মানুষের জন্য উপকারী। যেমন : আগুন, পানি কিংবা প্রাণীদের মধ্যে গরু প্রভৃতি। এককথায়, কোন প্রাণী বা সৃষ্টি মানুষের জন্য কতটুকু কল্যাণকর—তা বিবেচনা করেই মানুষ তাকে সম্মান দিত বা উপাসনা করত।

এই প্রকৃতি চর্চার বিপরীতে কুরআনই সর্বপ্রথম মানুষকে নির্দেশ দেয়—মানুষ যেন প্রকৃতি অথবা ঐশ্বরিক কোনো সৃষ্টির উপাসনা না করে; বরং এই সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করে। কুরআন সর্বপ্রথম মানুষের যৌক্তিকতাকে কাজে লাগানোর তাগিদ দেয়। আল কুরআন মানুষকে প্রকৃতির নানা সৃষ্টিতে আল্লাহর বিদ্যমান নিদর্শনগুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে বলে এবং তার আলোকে নিজেদের জ্ঞানকে বিকশিত ও উন্নত করার আদেশ দেয়। আল কুরআনই মানুষকে সবার আগে জানায়—প্রতিটি মানুষের আমলনামায় পার্থক্য থাকবে এবং মানুষকে এই ভিন্ন ভিন্ন আমলনামার ভিত্তিতে তুলনা করা হবে। কুরআনের এই নির্দেশনাগুলোর কারণে প্রকৃতির ব্যাপারে মানুষের প্রচলিত ধারণার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। একই সঙ্গে, যৌক্তিকতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে মুসলমানদের বিজ্ঞান বিষয়ে সাধনা করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মূলত, তার ভিত্তিতেই পৃথিবীতে মুসলমানদের হাত দিয়ে অভূতপূর্ব কিছু পরিবর্তন ঘটে।

একই সঙ্গে মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় আচারাদি পালন করার তাগিদেই গাণিতিক অনুশীলনে ও গবেষণায় মনোযোগী হতে হয়। সঠিক সময়ে এবং সঠিক দিকে নামাজ পালন করার স্বার্থে মুসলমানদের চাঁদের গতিপথ, তারার গতিপথ এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। পাশাপাশি, আল কুরআন মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম যুগান্তকারী ঘোষণা হিসেবে জাকাতের মতো কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক বিধান এবং পিতা-মাতার সম্পত্তিতে সন্তানের উত্তরাধিকারের বিধান প্রণয়ন করে। আবার এই অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিধানগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলমানদের ক্যালকুলাস, ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতিক ও গাণিতিক নানা বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়।

আল হাইসামের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো ফ্রান্সিস বেকনকে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছে। ফলে বেকন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক বেশ কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কার করে গেছেন। ফ্রান্সিস বেকনের সমস্ত কাজের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে ইউরোপে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ঘটে, যা পরিশেষে রেনেসাঁসে পর্যবসিত হয়।

কুরআন যেকোনো মতামত ও তত্ত্ব প্রদানে যৌক্তিকতাকে গুরুত্ব দেওয়ায় মুসলিম বিজ্ঞানীগণ যৌক্তিক ও গবেষণাধর্মী কর্মকৌশল চর্চায় নেমে যেতে বাধ্য হন। ইসলামই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করেছে—যৌক্তিকতা এবং ওহির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্যতা বা অসংগতি নেই। তাই পশ্চিমাজগতে ধর্মকে বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করা হলেও মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে এমন ভাবনার অস্তিত্ব কখনোই ছিল না। আলভি এবং ডগলাস[৩] মুসলিম বিজ্ঞানীদের অসাধারণ অগ্রসরতার নেপথ্যে পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো—

১. জ্ঞান অর্জনের ওপর ইসলামের অপরিসীম গুরুত্ব প্রদান।
২. মুসলিম শাসক ও অভিজাত শ্রেণি থেকে দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের অব্যাহতভাবে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা প্রদান।
৩. অপরের সাথে চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে মুসলমানদের সহজাত আগ্রহ।
৪. গোটা মুসলিম জাহানে একক ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার বিস্তৃতি এবং
৫. ইসলামের ধর্মীয় আচারাদি পালন করার জন্য সঠিক সময় ও যথার্থতা নিশ্চিত করার তাগিদ।

পরবর্তী সময়ে কলিশও[৪] মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির নেপথ্যের কারণ হিসেবে একই বিষয়গুলোকে নির্ণয় করে গেছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইরাকের ফিনিশীয় অঞ্চল থেকে যুক্তি ও জ্যামিতিসংক্রান্ত জ্ঞানের উদ্ভব হলেও তা ক্রমান্বয়ে মিশরে এবং আরও পরে গ্রিসে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা প্রথমত গ্রিক তথ্য-উপাত্ত থেকেই জ্যামিতি ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। পাশাপাশি, মুসলমানরা ইন্দো-ইরানীয় অঞ্চল থেকেও জ্যোতির্বিদ্যা পাটিগণিতবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে এই জ্ঞানগুলোকে মুসলমানরা ভিন্ন একটি মানে উন্নীত করে।[৫] এভাবে একটি সংঘবদ্ধ জ্ঞানের কাঠামোতে মুসলমানদের প্রবেশের ফলে শুধু মুসলমানই নয়; বরং গোটা মানব সম্প্রদায় যৌক্তিকতার স্তর থেকে উন্নীত হয়ে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট স্তর সম্পর্কে[৬] জানার সুযোগ পায়।

ইসলামি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে ওয়েন গিনগেরিচ[৭] বলেন—'মধ্যযুগের ইউরোপে জ্যোতির্বিদ্যা যখন নিভু নিভু অবস্থায়, ঠিক সেই সময়ে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে জ্যোতির্বিদ্যার নতুন সমৃদ্ধ ইতিহাস রচিত হয়।' ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্বসূরি মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কেননা, মুসলমানদের কাছে একদিকে যেমন প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় আবিষ্কৃত তথ্যগুলো ছিল, ঠিক তেমনি নিজেদের গবেষণালব্ধ একটি সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডারও সুরক্ষিত ছিল।

ইতঃপূর্বে আমরা যেমনটা বলেছি, আল হাইসামের যৌক্তিক ও গবেষণা সমৃদ্ধ কার্যপ্রণালি পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীদের মৌলিক ও ফলিত—উভয় শাখাতেই নিত্য-নতুন অসংখ্য আবিষ্কার করতে সহযোগিতা করেছে। মুসলিম বিজ্ঞানীরা একটা পর্যায়ে অনুধাবন করেন—বস্তুগত দৃশ্যমান জগৎ নিয়ে গবেষণার অনেক সুযোগ থাকলেও আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে এ রকম গবেষণা করার সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি। তবে পরবর্তী সময়ে আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসায় ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনাকেও মুসলমানরা যুক্তির বিচারে বিবেচনা করতে শেখে। ফলে মুসলমানদের ভেতরে দুই ধরনের জ্ঞান প্রসারিত হয়; একটি হলো—ঐশ্বরিক উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আর দ্বিতীয়টি গবেষণালব্ধ জ্ঞান।

জ্ঞানের গণতন্ত্রায়ন

ইসলামে বিজ্ঞান চর্চার ওপর যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা সঠিকভাবে বোঝা যাবে কুরআনে বর্ণিত তাওহিদের (একক) ধারণার মধ্য দিয়ে। কেননা, তাওহিদের এই ধারণা দিয়েই দৃশ্যমান সকল বৈচিত্র্য এবং আন্তনির্ভরশীলতাকে উপলব্ধি করা যায়। প্রথম একক হলো—এই বিশ্বজগতের প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক, তা মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অখণ্ডতাকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয় একক হলো—মহাবিশ্ব যেভাবে একই পদ্ধতিতে অত্যন্ত পরিশীলিত ও সুশৃঙ্খল উপায়ে প্রতিনিয়ত চলছে, তাতে বোঝা যায়—এর পেছনে একজন মাত্র নিয়ন্ত্রক আছেন। যদি অনেকগুলো নিয়ন্ত্রক থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে দেখা দিত একধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। তৃতীয় যে এককের কথা বলা দরকার, তা জীবিত সকল প্রাণীর জৈবিক কাঠামোবিষয়ক। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন—

> 'আমি জীবিত সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।'
> সূরা আম্বিয়া : ৩০, সূরা আন নুর : ৪৫, সূরা ফুরকান : ৫৪

এই আয়াতগুলো এমন একটি সময়ে নাজিল হয় যখন জৈবিক এককসংক্রান্ত কোনো জ্ঞান মানুষের ছিল না। মানুষের জ্ঞান ও চিন্তার পুরোপুরি বাইরের একটি বিষয় কুরআনে এভাবে চলে আসায় প্রমাণিত হয়, আল কুরআন প্রকৃতপক্ষেই ঐশ্বরিক একটি গ্রন্থ।

মানুষের পারস্পরিক যে সম্পর্ক, তার আলোকেই চতুর্থ একককে চেনা যায়। আর তা হলো—আল্লাহ মানুষকে একটি জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখান থেকে গোটা মানবজাতিকে এই সংখ্যায় তিনি সৃষ্টি করেছেন। এই সংক্রান্ত কথা পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারা : আয়াত ২১৩, সূরা আন নিসা : আয়াত ১, সূরা জুমার : আয়াত ৬ এবং সূরা লোকমান : আয়াত ২৮-তে।

একক একটি জোড়া থেকে সকল মানুষের সৃষ্টির যে ধারণা, তা মানুষের জন্য জ্ঞানকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে। সুদানি শিক্ষাবিদ ড. আব্দুল ওয়াহিদ ইউসুফ[৮] বর্তমানে ইউনেস্কোর উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি জাতিসংঘে বিভিন্ন নথিপত্র এবং তাত্ত্বিক প্রমাণের মাধ্যমে শিক্ষাসংক্রান্ত ২০ দফার একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি সেখানে দেখিয়েছেন—শিক্ষা প্রদানের এই বিষয়গুলো নবম শতকে আব্বাসীয় খিলাফতের সময় থেকেই নিয়মিত চর্চা হতো। অর্থাৎ মানব ইতিহাসে সেই আব্বাসীয় আমলেই প্রথমবারের মতো ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য জ্ঞানকে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়। ফলে যে কারও পক্ষে সুযোগ তৈরি হয়ে যায় জ্ঞান অর্জনের। ইসলামের দেওয়া জ্ঞান অর্জনের এমন সুযোগের কথা অন্য সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে কল্পনাও করা যেত না। শুধু তা-ই নয়; ইতিহাস থেকে জানা যায়—গ্রিক, রোমান বা ভারতীয় সভ্যতায় ক্ষমতাসীন মহল সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকদের জ্ঞান অর্জন এবং সংস্কৃতি আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

মুসলমানরা অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোট ৭০০ বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই সময়গুলোতে মুসলমানরা খিলাফতের আওতাধীন নানা অঞ্চলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও চালু করেছিল। প্রাচ্যের নিকটে, উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেনের টলেডো, কর্ডোভা ও সেভিলে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত এবং সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা পড়াশোনা করতে আসত।

ইউরোপিয়ান ছাত্ররা মুসলমানদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে এসে জ্ঞান অন্বেষণ, জ্ঞান অর্জন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইসলামের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলো দেখে অভিভূত হয়। শিক্ষাগ্রহণ শেষে নিজেদের দেশে ফিরে তারা ইউরোপীয় তৎকালীন ক্ষমতাসীন চার্চ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে মুসলমানদের মতো একই ধরনের অধিকারের দাবি করতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই চার্চের প্রধান এবং ক্ষমতাসীন মহল তাদের সেই দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে চার্চ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা ইউরোপজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়—যা পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনে রূপ নেয়।

ইসলামে জ্ঞানের পঞ্চম একক হলো—সত্য বা হকের ওপর থাকা। কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গি না জেনেই হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী অ্যাডওয়ার্ড উইলসন[৯] তার 'কনসিলিয়েন্স' নামক গ্রন্থে আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেন—যাতে বিচ্ছিন্ন, অসামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান অন্বেষণের প্রক্রিয়াগুলো থেকে বেরিয়ে এসে একটি সমন্বিত জ্ঞান অন্বেষণ প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করা যায়। এই ধরনের সত্যপন্থি ও সমন্বিত জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া ইসলামে অবশ্য নতুন কিছু নয়।

মুসলমানেরা উচ্চশিক্ষা, নথি প্রস্তুতকরণ, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ নির্বাচন এবং আরবি অক্ষর প্রবর্তনসহ কৃষি, চিকিৎসা, স্থাপত্য এবং যাতায়াতে দিক নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। পরবর্তী সময়ে এর ভিত্তিতেই ইউরোপ অগ্রসর এবং মুসলমানদের আবিষ্কৃত এই সব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁস ও সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত হয়। পাশাপাশি আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইউরোপিয়ানরা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করলে ইউরোপে স্বর্ণসহ নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রী আসতে শুরু করে। মুসলমানদের সোনালি যুগে উচ্চতর পড়াশোনা, গবেষণা, উন্নতি এবং নির্মিত প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, হাসপাতাল ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলো তীর্থস্থান ছিল মুসলিম অধ্যুষিত শহরগুলো। যেমন—মদিনা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভা, টলেডো ও সেভিলে।[১০] এমনকী মুসলমানদের বানানো স্থাপত্য নিদর্শনকে অনুকরণ করেই পরবর্তী সময়ে ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে ভবন ও অন্যান্য স্থাপত্য নির্মিত হওয়া শুরু করে।

আরবি সংখ্যা আবিষ্কৃত না হলে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করা ছিল অসম্ভব। কারণ, পূর্বে আবিষ্কৃত রোমান সংখ্যাগুলো বড়ো হিসাব করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। মুসলমানরা শিক্ষা, জ্ঞানে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কতটা এগিয়ে গিয়েছিল,

তার ধারণা পাওয়া যায় দশম শতকের প্রখ্যাত গবেষক ইবনে আল নাদিম আল ফেহরিস্তের[১১] কাছ থেকে। কেননা, তিনি প্রায় ৪০০০ মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের কর্মকাণ্ডকে একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ইবনে খাল্লিকুনের সাত খণ্ডের জীবনীগ্রন্থমূলক ডিকশোনারি 'ওয়াফিয়াত আল আয়ান ওয়া আনবা আবনা আল জামান' গ্রন্থে উচ্চশিক্ষায় মুসলমানদের নানা ধরনের অবদানকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১২]

এ রকম আরও অনেক গ্রন্থ তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যার মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময়ের মুসলমান বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গবেষকদের অনেক বই আরবি ভাষা থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ধারণা করা হয়, মুসলমানদের রচিত ৭০ হাজারেরও বেশি গ্রন্থ অনুবাদ করাই সম্ভব হয়নি।

গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান

ইতোমধ্যেই একবার বলা হয়েছে—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো পড়ার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা, রমজান মাসের সময় শুরু ও শেষ নির্ধারণ, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বণ্টন এবং জাকাতের নিসাব নির্ধারণসহ ইসলামের মৌলিক কিছু বিধিবিধানের কারণেই মুসলমানদের গণিত চর্চায় মনোযোগী হতে হয়। ভাষার মাধ্যমে যেমন কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন হয়, ঠিক তেমনই গণিতের মাধ্যমেও প্রাকৃতিক ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক নির্ণীত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, অষ্টম শতাব্দী থেকেই আরবি ভাষা ছিল উচ্চশিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। অঙ্ক এবং যাবতীয় গাণিতিক হিসাব এবং পরিসংখ্যানের চর্চা শুরু হয় আরবি অক্ষর দিয়েই।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ থেকে সংখ্যার ধারণা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আরবি সংখ্যার প্রচলন করে। মুসলমানদের মাধ্যমেই শূন্যবিষয়ক ধারণা, দশের দশমাংশ ভিত্তি এবং গণিতের নতুন তথ্য ক্রমান্বয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। অষ্টম শতকের আগে একজন ব্যক্তিকে ১ মিলিয়ন বোঝাতে হাজারবার এম লিখতে হতো। অতএব, অনুমান করা যায়, ৭ অঙ্কের কোনো হিসাব মেলাতে একজন ব্যক্তিকে কত বেশি লিখতে হতো!

নবম শতাব্দীতে আল খাওয়ারিজমি অ্যালগরিদমের উন্নত সংস্করণ আবিষ্কার করেন। এখানে উল্লেখ্য, অ্যালগরিদম নামটি ইউরোপিয়ানরা দিলেও এই নামটি এসেছে আরবি থেকে। আল খাওয়ারিজমি সবার আগে গাণিতিক নিয়ম এবং ত্রিকোণমিতির মৌলিক কিছু সূত্র উদ্ভাবন করেন। পাটিগণিত এবং জ্যামিতিক বিভিন্ন সূত্র ও হিসাব, পাই, হাইপার বল প্রভৃতির হিসাবগুলোও সবার আগে মুসলমানরাই প্রচলন করেন। পরবর্তী সময়ে ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের কাছ থেকেই এই বিদ্যাগুলো অর্জন করে।

মুসলিম গণিতবিদ আল মুতাওয়াক্কিল আল ফারঘানি সর্বপ্রথম নিলোমিটার (নীলনদের পানি পরিমাপক) যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিবলার দিক নির্ধারণ করার জন্য আবিষ্কার করা হয় কম্পাস। ইসলামে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের ব্যাপারে জেইন নরম্যান বলেন—

> 'চিত্রকলা এবং ইসলামের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা রীতিমতো প্রশংসনীয়। দেখা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যেসব মুসলিম চিত্রশিল্পীরা ছিলেন, তাদের মাঝে জ্যামিতিক ধারণাগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল। ইসলাম যেহেতু জাতি থেকে জাতিতে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়েছে, তাই সেই সুযোগে মুসলিম চিত্রশিল্পীরা তাদের জ্যামিতিবিষয়ক আগ্রহকে বিদ্যমান ঐতিহ্যের সাথে সমন্বয় করে কাজ করেছেন। এভাবে তারা ইসলামি চিত্রকলার নতুন একটি ধারা সূচনা করেছিলেন। মুসলিম চিত্রশিল্পীদের চিত্রকলায় তাই যুক্তি এবং মহাবিশ্বের শৃঙ্খলিত বিধিবিধানের নেপথ্যে ইসলামের ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।'[১৩]

রসায়ন শিল্পে মুসলমানদের অবদান

অষ্টম শতকে চীনের পশ্চিমাংশ জয় করে মুসলমানরা। এরপর থেকেই তারা চাইনিজ প্রযুক্তিবিদদের বিভিন্ন আবিষ্কারের ফায়দা হাসিল করতে শুরু করে। বিশেষ করে চীন থেকেই মুসলমানরা প্রথম কাগজের আবিষ্কার পদ্ধতি শেখে। আর তা গোটা মুসলিম জাহানের সর্বত্র প্রেরণ ও প্রয়োগ করতে শুরু করে। মুসলিম স্পেনের মধ্য দিয়ে কাগজ আবিষ্কারের এই পদ্ধতি কালক্রমে ইউরোপে ঢুকে যায়। জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে কাগজের আবিষ্কার ছিল অনবদ্য ভূমিকায়।

কাগজের বই ছাপা হওয়ার মাধ্যমে একটি সহজ ও বহনযোগ্য কাঠামোতে জ্ঞানের হস্তান্তর বা স্থানান্তর শুরু হয়। তাই মুসলমানরা এতদিনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাগজের বইয়ে নিয়ে আসা এবং পর্যায়ক্রমে সেই বইগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয় গোটা পৃথিবীতে।

মুসলমানেরা রসায়নশাস্ত্রে অসামান্য ভূমিকা রাখে। আরবিতে রসায়নকে বলা হয় আলকেমি। মুসলমানরাই গবেষণা ও উন্নয়নের মৌলিক পন্থাগুলো আবিষ্কার করেন। বিশেষ করে ঊর্ধ্বপাতন, স্ফটিকীকরণ, বাষ্পীকরণ, পাতন, বিশুদ্ধকরণ, একত্রীকরণ এবং সালফার, হাইড্রোক্লোরিক, অ্যাসিটিকসহ বিভিন্ন ধরনের এসিডের ব্যবহার মুসলমানরাই প্রথম শুরু করে। এই রাসায়নিক কৌশলগুলো ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মাধ্যমে শুরু হয় চিনি, নানা ধরনের ডাইং এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে অ্যালকোহল ও আর্সেনিকের উৎপাদন। ৯৫০ সালে এসে মুসলমানরা আবিষ্কার করে—কীভাবে পারদকে উত্তপ্ত করে মারকিউরিক অক্সাইড (এইচজিও) তৈরি করা যায়। এটি একটি অসাধারণ আবিষ্কার। কেননা, এতে একটি পদার্থকে নতুন আরেকটি পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়, কিন্তু মূল পদার্থটির পরিমাণের কোনো হেরফের হয় না। মুসলমানরা পরিচ্ছন্নতা ও নান্দনিকতার ওপর সব সময়ই গুরুত্ব দিত। তাই স্বর্ণ বিশুদ্ধ করে কীভাবে অলংকার নির্মাণ করা যায় কিংবা কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করা হয় অথবা বিভিন্ন স্থাপত্য কীভাবে সুন্দর করা যায়—এই বিষয়গুলো নিয়ে মুসলমানরাই পরবর্তী সময়ে ব্যাপক আকারে কাজ করে।

পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

নবম শতকে এসে মুসলিম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে বস্তুর শক্তি, এর কাঠামো ও স্থিতিশীলতাবিষয়ক সূত্রগুলো। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আল কিন্দি প্রথম আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের বিষয়টি আবিষ্কার করেন। সেইসঙ্গে তিনি আবিষ্কার করেন শব্দ ও শূন্যস্থান সম্পর্কিত তথ্য। ১০ম ও ১১ শতকে মুসলমানরা পেন্ডুলাম সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক নীতিমালা আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও এরও প্রায় ৪০০ বছর পরে এ সংক্রান্ত সূত্রগুলো আবিষ্কার করলেও আমরা গ্যালিলিওর আবিষ্কার সম্বন্ধেই বরং বেশি সচেতন। উল্লেখ্য, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে—এই তথ্যটি আবিষ্কার করার জন্য গ্যালিলিওকে তৎকালীন খ্রিষ্টানরা দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। ১৯৯২ সালে এসে তৎকালীন পোপ গ্যালিলিওর সেই অপরাধকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা করেন।

দশম শতকে আল হাইসাম তাঁর বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৩৪০ সাল পর্যন্ত ইউরোপে সাইন্স বা বিজ্ঞান শব্দটির নামগন্ধও ছিল না। আর ১৮৪০ সালে এসে ইংরেজি ভাষায় প্রথম সাইন্স শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

৯৬৫ সনে আল হাইসাম জ্যামিতিক অপটিকসের ওপরে সূত্র আবিষ্কার করেন—যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে ইউরোপিয়ানরা ক্যামেরা, আই গ্লাস আবিষ্কার করে। আরও পরে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এসে স্নেল তার ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ আবিষ্কার করেন।

সাম্য বা সমান সত্তা এবং বর্ণশঙ্করতার ওপর নির্ভর করে মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রথম বাতাস সম্পর্কিত তথ্য আবিষ্কার হয়। ছবির বিকার ও স্খলনের বিষয়টিও মুসলমানরাই প্রথম আবিষ্কার এবং তাকে কাজে লাগিয়ে তারা নানা ধরনের লেন্স ও আয়না তৈরি করেন। মুসলমান বিজ্ঞানীরা শুধু যে আলোর গতি সম্পর্কে ধারণা রাখতেন তা-ই নয়; বরং আলো এবং শব্দের গতির যে তারতম্য, তা-ও তারা বুঝতেন। মুসলমানরাই আবিষ্কার করেন, শব্দের চেয়ে আলোর গতি বেগ অনেক বেশি। মুসলিম পদার্থবিজ্ঞানীরা মেকানিক্স ও হাইড্রোস্ট্যাটিক-সংক্রান্ত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করেন। আর সেগুলো কাজে লাগিয়ে সারফেস, সুনির্দিষ্ট মধ্যাকর্ষণ এবং বিভিন্ন জিনিসের আলাদা আলাদা ঘনত্ব সম্পর্কে তথ্য সম্পর্কেও জানতে পারেন।

আইজ্যাক নিউটন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিসম্পর্কিত তত্ত্ব আবিষ্কারের কয়েকশো বছর আগে ১২ শতকেই আবু আল ফাতাহ আব্দুর রহমান আল খাজিনি আবিষ্কার করে ফেলেন। তবে আফসোস! আমরা এই তথ্যগুলোকে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত করতে পারিনি। শুধু মধ্যাকর্ষণ শক্তিই নয়; আল খাজিনি হচ্ছেন সেই বিজ্ঞানী, যিনি অপটিক্যাল কাঠামোর ভিত্তিতে রংধনুর রংগুলোকে বিশ্লেষণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি জ্যোতির্বিদ্যাসংক্রান্ত নানা ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করেন—যার সমন্ধে বিস্তারিত তথ্য তার রচিত *মিজান আল হিকমাহ* নামক গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪]

১২ শতকের মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ওমর খৈয়াম পশ্চিমা জগতে নিছক একজন কবি হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি গণিতশাস্ত্রে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি ক্যালেন্ডারের হিসাবকে সংশোধন করেন।

এর আগে ৩৩৩০ বছরকে মাথায় নিয়ে যে ক্যালেন্ডারটির প্রবর্তন করা হয়েছিল, তাতে কিছু ভুল ছিল। তিনি সেই ভুলগুলো সংশোধন এবং ৫০০০ বছরকে বিবেচনায় নিয়ে ক্যালেন্ডার রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে সমরখন্দের আরেকজন মুসলিম বিজ্ঞানী উলুগ বেগ এই হিসাবকে আরও উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত করেন।

আল খাওয়ারিজমি কিছু অবদানের কথা ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইসলামিক জ্যোতির্বিদ্যার জনক। গ্যালিলিওর কয়েকশো বছর আগে তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা আবিষ্কার করেন, পৃথিবী গোলাকার। সেইসঙ্গে তারা বিশ্বজগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব সম্পর্কেও তথ্য প্রদান করেন।

নবম শতকের বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ আবু মাশার অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হন। তিনি প্রথম চাঁদের বিভিন্ন স্তর, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় নির্ধারণ এবং তার আলোকে জোয়ার-ভাটা হওয়ার বিষয়টি আবিষ্কার করেন। সেইসঙ্গে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিধির যে ভিন্নতা তা-ও তিনি উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি, যিনি স্থলজ মাত্রাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বলেন, এর পরিমাণ হলো ৫৬.৬৭ আরব মাইল।

আল সাআতি খোরাসানি ১২ শতাব্দীতে সিরিয়ার দামেস্কে একটি ক্লক টাওয়ার বা ঘড়ি ভবন নির্মাণ করেন। মুসলিম ভূগোলবিদ আল ইদ্রিসি প্রথম পৃথিবীর একটি মডেল গ্লোব নির্মাণ করে তৎকালীন সময়ের প্রতাপশালী শাসক রাজা দ্বিতীয় রজারকে উপহার দেন। আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আব্দুর রহিম ১০০০টিরও বেশি তারাকে চিহ্নিত ও নামকরণ করেন। সেইসঙ্গে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সম্বন্ধেও তিনি তথ্য আবিষ্কার করেন। পাশাপাশি তিনি কৃষি, স্থাপত্য, সাহিত্য এবং ভাষাতত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যান।

ফলিত পদার্থবিদ্যার চর্চায় মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। আল জাজারি ১৩ শতকে 'কিতাব আল মারিফা ওয়াল হিয়াল আল হানদাসাহ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি হাইড্রোলিক প্রযুক্তির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লিখে গেছেন। তাঁর সমসাময়িক ছিলেন নাজাম আল রাম্মাহ। তিনি আতশবাজিসংক্রান্ত প্রযুক্তি এবং যন্ত্র আবিষ্কার করে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে এই প্রযুক্তি প্রতিরক্ষা এবং উৎসব-আয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৮৪৫ সালে অর্থাৎ ডারউইনের প্রায় ১০০০ বছর পূর্বে আল নাজ্জাম নামে মুসলিম একজন দার্শনিক 'থিওরি অফ ইভোলিউশন, বা বিবর্তনবাদের তত্ত্ব প্রদান করেন।

কাছাকাছি সময়ে, আল জাহিজ নামের অপর এক মুসলিম বিজ্ঞানী প্রাণীদের ওপরে; বিশেষ করে প্রাণীর বেঁচে থাকা এবং পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চলার বিষয়ে উপস্থাপন করেন বিস্তারিত তথ্য। নবম শতকে আল হাসিব সর্বপ্রথম রচনা করেন দামি পাথরের উপকারিতাবিষয়ক গ্রন্থ। এরপরে ১৩ শতাব্দীতে আল তিফাসি এই গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং চব্বিশটি মূল্যবান পাথর, তাদের উপকারিতা ও প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুসলিম প্রাণিবিজ্ঞানী—বিশেষত আল জাওয়ালিকি, আব্দুল মুমিন এবং আল ধামিরি, প্রাণিবিজ্ঞান ও দৈহিক গঠনতন্ত্র বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা সম্পন্ন করেন। বিশেষ করে ঘোড়ার শারীরিক কাঠামো ও তাদের দুগ্ধপান বিষয়ে তাঁরা সুনির্দিষ্ট তথ্য দেন।

মুসলিম উদ্ভিদবিজ্ঞানী আলদিমাসকি উদ্ভিদবিদ্যাসংক্রান্তে ব্যাপক পড়াশোনা করেন। বিভিন্ন গাছের রোগ নিয়েও তিনি পর্যালোচনা করেন। তিনি প্রথম গাছকে জীবন্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং গাছের লিঙ্গ নির্ধারণ করেন। আল বেরুনি সাধারণভাবে একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত তিনিই প্রথম ইন্দুস উপত্যাকা এবং এই এলাকায় গড়ে উঠা সভ্যতার উৎস আবিষ্কার করেন। তিনি আরও আবিষ্কার করেন—ফুলের পাপড়ি সাধারণত তিনটি, ছয়টি বা আটটি হয়। কখনোই সাতটি বা ৯টি হয় না। এর পাশাপাশি, আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে অসংখ্য মুসলিম বিজ্ঞানী রয়েছেন, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

বিজ্ঞানচর্চায় মুসলমানদের অনগ্রসরতার সূচনা

ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই এই প্রশ্নটিই তোলা হয়—মুসলমানরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথ থেকে কেন সরে এসেছিল? সরে আসার পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ আছে, আবার কিছু কারণ আছে বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক। এই কারণগুলোই মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে স্থবিরতা নিয়ে আসে এবং ফলে মুসলমানদের পতন ত্বরান্বিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়—যখনই মুসলিম অধ্যুষিত কোনো দেশ বা রাষ্ট্র অনেক বেশি ক্ষমতা হাতে পেয়েছে, তখন তাদের মাঝে ঔদ্ধত্য আচরণ, অজ্ঞতা, আশপাশের দেশ বা জাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা এবং সঠিক করণীয় বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ না

করাসহ নানা ধরনের সংকটের জন্ম হয়। সফল হতে গেলে কিংবা সফলতা ধরে রাখতে গেলে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য প্রয়োজন। বিশেষ করে জীবনযাপন, শরীর, মন এবং আত্মাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মকৌশলের প্রয়োজন পড়ে। এই জায়গাগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে বাকি সব ক্ষেত্রেও সমস্যা শুরু হয়ে যায়।

প্রথমদিকে, ইসলামকে একটি সম্পূর্ণ, পরিণত, পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে চর্চা করা হতো। একটা পর্যায়ে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। ফলে ইসলামের মূল চেহারায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পরিপূর্ণ জীবনদর্শন হিসেবে ইসলামকে যতদিন প্রয়োগ করা হয়েছে, ততদিন কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যখন ইসলামকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন সমন্বিত সেই সুব্যবস্থাটি আস্তে করে ভেঙে পড়ে।

আগে ইবাদতকে একটি ব্যবহারিক আচারাদি হিসেবে গণ্য করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা নিছক ধর্মীয় আচারাদিতে পরিণত হয়। আগে একজন মানুষ অতিরিক্ত কাজ করে মানবতার কল্যাণে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করত। পরবর্তী সময়ে এই ধরনের অতিরিক্ত কাজগুলোকে নফল ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রাথমিক যুগে সব ধরনের জ্ঞান অন্বেষণের যে আগ্রহ ছিল, পরবর্তী সময়ে গিয়ে তা নিছক ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিকতার বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম যুক্তি ও সৃষ্টিশীলতার চর্চা করার সুযোগ দিলেও পরবর্তী সময়ে তা আর অব্যাহত রাখা যায়নি।

মুসলমানরা রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবি মুয়াজ ইবনে জাবাল ؓ-এর একটি ঘটনা থেকে প্রত্যাশিত মানে শিক্ষা নিতে পারেনি। মুয়াজ ইবনে জাবাল ؓ-কে ইয়েমেনের গভর্নর হিসেবে পাঠানোর সময় রাসূল ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—তিনি কীভাবে ইয়েমেনকে পরিচালনা করবেন। মুয়াজ ؓ উত্তর দিয়েছিলেন—যেসব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি কুরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু যেগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোনো উত্তর পাওয়া যায় না, সেখানে তিনি ইজতিহাদ করবেন। অর্থাৎ তিনি সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যার সমাধানে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিকে প্রয়োগ করবেন। মুয়াজ ইবনে জাবাল ؓ-এর এই উত্তর শুনে রাসূল ﷺ খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, বিভাজন এবং মুতাজিলাদের কার্যক্রমের কারণে যৌক্তিক পর্যালোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই সুযোগে আশারাইতদের উত্থান হয়—যারা সমসাময়িক সমস্যাতেও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ শুরু করে। আশারাইত দর্শনের লোকেরা পুরোনো চিন্তাধারা ধারণ করতেন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ইসলামের প্রথম যুগের শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদরা কুরআন-সুন্নাহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন, তা দিয়ে ভবিষ্যতের যেকোনো সংকটের সমাধান করা সম্ভব।

আশারাইতের এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে অমূলক ছিল না। কেননা, এর পূর্বে যুক্তির নামে যে ভয়াবহ ভণ্ডামি ও প্রতারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা নিয়ন্ত্রণকল্পে এই ধরনের একটি রক্ষণশীল চিন্তাধারার উত্থান অনেকটা স্বাভাবিকই ছিল। এমনকী মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু শাসকও ছিলেন—যারা যুক্তি বিচক্ষণতার দোহাই দিয়ে সৃষ্টিশীলতা ও অভিনবত্বকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করেছেন। আবার এমন শাসক পাওয়া যায়, যারা সেকেলে চিন্তাধারার লোকদের পাল্লায় পড়ে অনুমোদনযোগ্য বিষয়েও নিজের যুক্তি ও বিচক্ষণতাকে কাজে লাগাতে পারেননি। অর্থাৎ যেসব বিষয়ে ইসলাম নিজের বিবেচনাবোধকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিয়েছে, সেগুলোতেও তারা এর প্রয়োগ করতে পারেননি।

ঐতিহ্য ও যৌক্তিকতার মধ্যে যে বিভাজন ঘটে যায়, তার মর্মান্তিক পরিণতি হিসেবেই মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চা ক্রমশ শ্লথ হতে থাকে। যারা ধর্মীয় চিন্তাবিদ ছিলেন, তারা অতীতের সব চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও আইনবিদদের লেখনীকে মুখস্থ করার ওপর জোর দেন। নিজেরা নতুন করে কোনো ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকেন।

মোটামুটি অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান চিন্তাবিদদের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে একধরনের খরা দেখা যায়। এরপরে আবার ইবনে ওয়াহাব, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, জামাল উদ্দিন আফগানি, মুহাম্মদ আবদুহু, মোহাম্মদ ইকবাল এবং মাওলানা মওদূদী (রহ.)-এর আবির্ভাব হয়। উপরিউক্ত ইসলামি চিন্তাবিদদের প্রত্যেকেই একদিকে যেমন ইসলামের মূল শিকড়কে ধারণ করার পক্ষে ছিলেন, একই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন ইসলামের বেঁধে দেওয়া কাঠামোর মধ্যে থেকেই উদ্ভূত নানা ইস্যুকে পর্যালোচনার পক্ষে। পাশাপাশি স্থান, কাল, পাত্র ভেদে তাঁরা একটি সমস্যাকে প্রয়োজনের আলোকে বিবেচনা করারও পক্ষেও মত দেন। তাঁরা শরিয়াহর পুরোনো বিধানগুলোকে নবায়ন করে বর্তমান সময়ের সৃষ্ট সংকট সমাধান করার সুপারিশ করেন।

মুসলমানদের বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—এগারো শতকের ক্রুসেডের ঘটনা, ১২৫৮ সালে মঙ্গোলীয়দের বাগদাদ দখল, ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন, ১৯২২ সালে খিলাফতের অবসান, সমাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিকতার উত্থান প্রভৃতি। এই সব ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মুসলমানদের জন্য আরও যে চ্যালেঞ্জগুলো যুক্ত হয়েছে তা হলো—তেলকেন্দ্রিক রাজনীতি, শক্তিশালী মিডিয়ার উত্থান, মজলুমকে অত্যাচারী এবং অত্যাচারীকে ভিকটিম হিসেবে চিত্রায়িত করার নোংরা অপপ্রয়াস।

নিম্নে আমরা তালিকা আকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের আরও বেশ কিছু অবদানের কথা সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি। এই বইটিতে বশির আহমেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অন্যান্য প্রাবন্ধিক সমাজবিজ্ঞান ও কলাসংক্রান্ত বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদানকে তাঁদের রচনাবলিতে উপস্থাপন করেছেন। সেই কারণে আমি এই তালিকাটি তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানটুকুই বিশেষভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অধিক সচেষ্ট থাকব।[১৫]

সংযোজনী-১

বিশ্ববিজ্ঞানের উৎসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান

সময় : ৭২১-৮১৫ (আব্বাসীয়)

বিজ্ঞানী : জাবির ইবনে হাইয়ান (আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক, যুক্তিবিদ এবং দার্শনিক)

মন্তব্য : ওয়ালিদ ইবনে মালিকের ৩০০০ সূত্র

- বৈজ্ঞানিক সূত্র, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং রসায়নের নানা উপকরণের পরিমাণগত ভারসাম্য
- পদার্থবিদ্যা : কারিগরিবিদ্যা
- ওষুধশাস্ত্র : ক্লিনিকাল প্যাথোলজি
- দামেস্কে প্রথম মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা।
- বাগদাদে বায়তুল হিকমাহর প্রতিষ্ঠা

সময় : ৮০১-৮৭৩

বিজ্ঞানী : আবু ইউসুফ আল কিন্দি (আল কিন্দুস)

- আরবের খ্যাতনামা দার্শনিক-বিজ্ঞানী

মন্তব্য : আল ফারাবির অগ্রজ

- পৃথিবীর যেসব স্থানে বসতি স্থাপন হয়েছে, তার সম্পর্কে প্রথম বর্ণনাকারী
- বাগদাদে আল শামাসিয়া নামক মানমন্দির প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বজুড়ে ডাকব্যবস্থার প্রচলন
- হিশাম আল কালবি এবং আল ইয়াকুবির সমসাময়িক

সময় : ৮১০-৮৭৭

বিজ্ঞানী : হুনাইন ইবনে ইসাক

মন্তব্য : চিকিৎসাবিদ-পদার্থবিদ

- গ্যালেন বিশেষজ্ঞ

সময় : ৮২৬-৯০১

বিজ্ঞানী : সাবিত ইবনে কুররাহ

মন্তব্য : প্যারাবোলোয়েডের ওপর ৩০০০ খণ্ড রচনা

- জ্যামিতির ৩য় ডিগ্রি সূচকের সূচনা
- গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা
- কম্পনসংক্রান্ত নীতিমালা
- নৌসংক্রান্ত উন্নয়ন (ভারতীয় সাগর, ভলগা এবং কাস্পিয়ান সাগর)
- প্রথম যুগের মানচিত্রসমূহ
- বালাখি, মাকদিসির সমসাময়িক

সময় : ?-৮৬৩ (আল-মামুনের যুগ)

বিজ্ঞানী : এম. আল খাওয়ারিজমি (অ্যালগরিথ)

মন্তব্য : আল জাবের আল মাকাবালাহ (অ্যালজেবরার উন্নয়ন)

- ইউরোপে আরবি সংখ্যার প্রচলন
- ত্রিমাত্রিক সমীকরণ

- জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত টেবিল
- সৃষ্টিশীল হিসাব-নিকাশ
- ভুগোল : পৃথিবীর আকৃতি
- আল শামাসিয়াতে মানমন্দির স্থাপন

সময় : ৮৬৫-৯২৫

বিজ্ঞানী : মুহাম্মাদ আল রাজি (১৮৪ কর্মী)

- হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসাবিদ (আল হাওয়ি), অ্যারিস্টটল-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি
- পদার্থবিদ্যার কাঠামোর আওতায় স্থান, কাল ও ক্ষয়-ক্ষতির ওপর গুরুত্বপ্রাপ্ত ডাটা পর্যবেক্ষণ
- অ্যালকেমির অগ্রগতি
- আল তাবারির ছাত্র

মন্তব্য : গুটিবসন্ত/হাম

- রাকায় আরেকটি মানমন্দির স্থাপন
- আবু আল ওয়াফা আল বুজ্জানি (৪ মাত্রার সমীকরণের জনক) এবং আল কারাখির সমসাময়িক

সময় : ৮৭০-৯৫০

বিজ্ঞানী : আবু নাসর আল ফারাবি

- দার্শনিক
- সমাজবিজ্ঞানী

মন্তব্য : অ্যারিস্টটলের ওপর বিস্তারিত গবেষণা

- প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস
- ইখওয়ান আল সাফা
- রিসালাত আল জামিয়া

সময় : ?-৯৫৬

বিজ্ঞানী : আবুল হাসান আল মাসুদি

- বিজ্ঞানী

- ইতিহাসবিদ
- নৃতাত্ত্বিক
- ভূগোলবিদ
- ভূতাত্ত্বিক

মন্তব্য : ভ্রমনকাহিনি

- স্বর্ণসহ বিভিন্ন খনিজ পদার্থের খনির আবিষ্কার

সময় : ৯৮০-১০৩৭

বিজ্ঞানী : আবু আলি ইবনে সিনা (অ্যাভেসিনা)

- চিকিৎসাশাস্ত্র
- ওষুধ বিশেষজ্ঞ

মন্তব্য : শায়খ আল রাইস

- ক্যানন (কামান)
- কিতাব আল শিফা
- দার আল ইলম (কায়রো)
- হামাদানে মানমন্দির স্থাপন
- শিক্ষাবিদদের সম্মেলন ও মিলনমেলা

সময় : ৯৬৫-১০৩৯

বিজ্ঞানী : আবু আলি আল হাইথাম (আল হাজেম)

- গণিতবিদ
- জ্যোতির্বিদ
- চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ
- চক্ষু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ

মন্তব্য : কিতাব আল মাকির, প্রথম চশমা তৈরি

- বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা
- নীলনদের প্লাবনের পরিমাপ
- সেভিলে মানমন্দির স্থাপন

- আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও বেগের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের আয়না নির্মাণ
- ন্যূনতম সময়ের নীতিমালা
- নুসাইরি খুসরো (ডায়রি), আল বাকরির সমসাময়িক

সময় : ৯৩৭-১০৫১
বিজ্ঞানী : আবু রায়হান আল বেরুনি

- গণিত, জ্যোতি, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বে ঐতিহাসিক অবদান

মন্তব্য : অ্যারিস্টটলের কাজের ওপর পর্যালোচনা

- প্রাচীন জাতিগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ণয়
- আল মাসুদির অনুশাসন
- নৌবিদ্যায় ব্যবহৃত অ্যাস্ট্রোবল
- পৃথিবীর গতি
- গ্রহগুলোর গতিপথ
- উপবৃত্তাকার কক্ষপথ
- সমসাময়িক : আল খাজিনি (পদার্থবিদ্যা)

সময় : ?-১০০৭
বিজ্ঞানী : আবু আল কাসিম আল মাজরিতি (মাদ্রিদ, কর্ডোভা)

- গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, এবং জ্যোতির্বিদ্যা

মন্তব্য : আল ইখওয়ানের শিষ্য

- টলেডোতে মানমন্দির স্থাপন

সময় : ১০৫৮-১১১১
বিজ্ঞানী : আবু হামিদ আল গাজালি

- দার্শনিক
- ধর্মবিজ্ঞানী

মন্তব্য : ধর্মসংক্রান্ত বিজ্ঞানের পুনরুত্থান

- সমসাময়িক : মানসুরি/ নুরি (হাসপাতাল)
- আল ইদরিসি (ভূগোল এবং উদ্ভিদবিদ্যা)

সময় : ১২ শতক
বিজ্ঞানী : রাহমান আল খাজিনি

- দ্যা গ্রিক

মন্তব্য : বিজ্ঞান বনাম বিচক্ষণতা

- মেকানিকস বনাম হাইড্রোস্ট্যাটিস্টিকস
- মধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র, ভারসাম্য এবং জ্ঞানের ভারসাম্য
- স্ট্যান্ডাড : ওজন

সময় : ১০৪০-১১৩০
বিজ্ঞানী : আবু আল ফাতহ উমর খৈয়াম

- গণিতবিদ
- বিজ্ঞানী
- কবি

মন্তব্য : অ্যালজেবরা

- চতুষ্পদি শ্লোক (ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেছেন ফিৎজগেরাল্ড)

সময় : ১১২৬-১১৯৮
বিজ্ঞানী : আবু আল ওয়াহিদ মুহাম্মাদ ইবনে রুশদ (অ্যাভেরুশ)

- চিকিৎসাশাস্ত্র
- ধর্মীয় আইন
- তুলনামূলক পর্যালোচনা

মন্তব্য : ভীষণভাবে অ্যারিস্টটল দ্বারা প্রভাবিত

সময় : ১২০১-১২৭৪
বিজ্ঞানী : নাসির আল দ্বী আল তুসি

- গণিতশাস্ত্র
- জ্যোতির্বিজ্ঞান
- দর্শন

মন্তব্য : বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম মেধাবী বিজ্ঞানী

- দ্যা তুসি কাপল

- তিনি হালাকুর হাত থেকে কিছু পাঠাগারকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন (মারাঘাতে মানমন্দির)
- গ্রহজগতের নতুন নকশা প্রণয়ন

সময় : ১২৩৬-১৩১১

বিজ্ঞানী : কুতুব আল দ্বীন আল সিরাজি

- চিকিৎসা (চক্ষুসংক্রান্ত)
- গণিত (জ্যামিতি)
- জ্যোতির্বিজ্ঞান (ভূগোল)
- দর্শন

মন্তব্য : ইবনে সিনা প্রদত্ত অনুশাসনের পর্যালোচনা

- জ্যোতি : পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিস্তারিত কার্যক্রম

সময় : ১৩৩২-১৪০৬

বিজ্ঞানী : আব্দুর রাহমান ইবনে খালদুন

- দর্শন
- ইতিহাসের বিজ্ঞান
- মনোবিজ্ঞান
- সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক

মন্তব্য : কুতুব আল ইবার

- উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস
- আল মুকাদ্দিমাহ
- সংস্কৃতির উত্থান ও পতন
- সমসাময়িক : কাশানি কাজিজাদাহ (ত্রিকোণমিতি)
- সামারখন্দ, বুস্তি ও মারিদিনিতে মানমন্দির স্থাপন

সময় : ১৫৪৬-১৬২১

বিজ্ঞানী : বাহাউদ্দিন আল আমিলি

- গণিতশাস্ত্র, রসায়ন, স্থাপত্য, ধর্মবিজ্ঞান

মন্তব্য : শায়খুল ইসলাম

- স্থাপত্যশিল্পে গণিত ও জ্যামিতির অবদান
- দশমাংশের হিসেবের সূচনা
- সমসাময়িক : ইয়াজদি এবং ইস্পাহানি

তথ্যসূত্র

1. Ishratullah Khan, 'Ehd-e-Mamun Ki Tibbi wa Falsafiyana Kutub Kay Trajim : Ek Tehqiqi Mutalea' [Translation of Medical and Philosophical Documents in the Abbasid Era : A Research Study] (1994), pp. 2 & 251
2. James Burke, *The Day the Universe Changed* (London: BBC, 1985), a companion book serialized on PBS in the late 1980s
3. Karima Alvi & Susan Douglass, 'Science and Religion : The Inseparable Traditions' (Manuscript, 1995), p.9
4. Marcia Colish, *Medieval Foundations on the Western Intellectual Tradition 400-1400: The Yale Intellectual History of the West* (New Haven, CT : Yale University Press, 1997), pp. 129-159
5. Philip Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan Education, 1970), pp. 363-428
6. Mehdi Nakhosteen, *Near-Eastern Origins of Western Higher Education* (Boulder, Co: University of Colorado Press, 1964)
7. Owen Gingerish, *'Islamic Astronomy'*, Scientific American 254 (10), (April 1986), p-74
8. A. Waheed Yousif, 'Lifelong Learning in the Early Abbasid Period' (unpublished PhD diss. Ontario Institute of Studies in Education, University of Toronto, Canada, 1978).
9. Edward Wilson, *Consilience: Unity of Knowledge* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998)

10. M. Abdul Aziz Salim & M. Salahuddin Hilmi, *Islam in North-West Africa and Spain*, ed. Levi Povencal (trans. 1990)

11. Ibn Nadim, al-Fehrist, *Arabic-Urdu trans.* Ishaq Bhatti (Lahore, Pakistan; Midway Press, 1990)

12. S. Moinul Haq (ed.), *Ibn Khaldun's Wafiyat al Ayan wa Anba al Zaman, trans. M. de Slane* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1996), Vol-1-7

13. Jane Norman, *Focus on Asian Studies; Asian Religion*, New Series (New York: Asia Society, 2001), Vol. 2 No. 1

14. N. Khanikoff (trans) 'al Khazini's Mizan al- Hikmah (The Balance of Wisdom), The Journal of the American Oriental Society, 6 (New Haven, CT: 1859)

15. You may refer to pre-conference document prepared for the regional conference of the Association of Muslim Social Scientists (AMSS) (Dallas, Texas, June 22-23, 2001), pp 61-86

সপ্তম থেকে ষষ্ঠদশ শতকে মুসলিম চিকিৎসক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের অবদান—এম. বাশীর আহমেদ

সূচনা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব সমাজটি মূলত ছিল অসভ্য, অজ্ঞ, অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বর্বর। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে তাদের আগ্রহ ছিল খুবই কম। এমতাবস্থায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ৬১২ থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে আল কুরআন নাজিল হয়। এই গ্রন্থটি ছিল হিদায়াতের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা। আরব সমাজে আল কুরআনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্ঞান অর্জন এবং মানবজীবনে শিক্ষা লাভের গুরুত্ব সম্পর্কে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে উদ্‌বুদ্ধ করেই পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াতটি নাজিল হয়। পবিত্র কুরআন বরাবরই প্রকৃতির নানা উপকরণ ও নিয়ামককে অনুধাবন এবং একই সঙ্গে ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে নিশ্চিত করার জন্য মানবজাতিকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। কুরআনের এই দিকনির্দেশনাগুলোর কারণেই মুসলমানরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও পর্যালোচনা করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

> ‘পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন কিছু জ্ঞান দিয়েছেন—যা সে জানত না।’ সূরা আলাক : ৩-৫

পবিত্র কুরআন এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে, তার সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য। আর মানুষ হলো আল্লাহর খলিফা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন কিছু সক্ষমতা দিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে পারবে। সেইসঙ্গে নিজেদের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতামতকেও মৌখিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবে।

> 'করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।' সূরা আর-রহমান : ১-৪[১]

পবিত্র কুরআন এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ মুসলমানদের জ্ঞান অর্জন এবং প্রকৃতির মাঝে বিদ্যমান আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে উপলব্ধি করার তাগিদ দিয়েছে। আর এভাবেই আদেশ এসেছে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন ও বিকাশের ব্যাপারে তৎপর হওয়ার। কুরআনের এই ধরনের নির্দেশনাগুলোর কারণেই একটা সময়ে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের বলিষ্ঠ ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার তাগিদ দিয়েছেন। পাশাপাশি আদেশ দিয়েছেন, পৃথিবীর রহস্য অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করতে।

> 'তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না, তা কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের প্রতি লক্ষ করে না, তা কীভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে, তা কীভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?' সূরা গাশিয়াহ : ১৭-২০

অন্য আরেকটি আয়াতে মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা ও উপলব্ধি করতে—

> 'এবং জমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে, একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙুরের বাগান আছে আর শস্য ও ভুট্টা রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত আবার কতগুলো আছে, যারা মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দিই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।' সূরা আর-রা'দ : ৪

পবিত্র কুরআনে এ রকম আরও অনেক আয়াত পাওয়া যাবে—যা মহাবিশ্বের রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে এবং মানুষকে প্রকৃতি উপলব্ধিকরণ এবং প্রকৃতির বিদ্যমান আইন-কানুন সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যা হচ্ছে এবং চারপাশে তার যে প্রভাব—তা গভীর মনোযোগের সাথে অবলোকন করার ওপর কুরআন গুরুত্ব দিয়েছে।

আল কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই—যা বিজ্ঞানে এখন অবধি আবিষ্কৃত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এভাবেই ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলোর সাথে ইসলাম প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। সর্বোপরি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, একমাত্র ইসলামই তা সফলভাবে দেখিয়ে দিয়েছে।[২] রাসূল ﷺ-এর একটি হাদিস আছে, যেখানে তিনি বলেছেন—'এমন কোনো রোগ নেই, যার প্রতিষেধক আবিষ্কার করা হয়নি।' যেহেতু বার্ধক্য ছাড়া অন্য সকল রোগের ওষুধ এবং প্রতিষেধক আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে রেখেছেন, তাই সেই সব লুকায়িত প্রতিষেধক আবিষ্কার করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। নবিজির নিম্নোক্ত হাদিসগুলো জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে—

> 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যাবশ্যক।'
>
> 'যে জ্ঞান অর্জনকে সম্মান করে, সে মূলত আল্লাহকে সম্মান করে।'
>
> 'জ্ঞান অর্জনকে প্রতিটি মুসলমানের লক্ষ্য বানিয়ে ফেলা উচিত।'
>
> 'পৃথিবীর কল্যাণ উপভোগ করতে হলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আবার কেউ যদি আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করতে চায়, তাহলেও তাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে।'[৩]

রাসূল ﷺ আরও বলে গেছেন, কেবল শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই পৃথিবীতে তার সঠিক প্রতিনিধিত্ব এবং এই জমিনে আল্লাহর খলিফা হিসেবে নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে। মুসলিম সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে—'জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলমানদের প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও।' পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ও আবিষ্কার, তার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা মুসলমানদের উচিত নয় বা বিজ্ঞানচর্চাকে কোনোভাবে নিষিদ্ধ বস্তু মনে করাও ঠিক নয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বেরিয়ে যায়, তার বাসায় ফেরত না আসা পর্যন্ত মূলত সে আল্লাহর পথেই সময় ব্যয় করে। আর আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত প্রাপ্তিকে সহজ করে দেন, যিনি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য সফরে বের হন।'[৪]

নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ জ্ঞান অন্বেষণে সফরে যাওয়ার কথা বলে গেছেন। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, তিনি শুধু কুরআন ও শরিয়াহর জ্ঞান অর্জনের কথা বলেননি। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত জ্ঞানের সম্ভাব্য উৎসসমূহ মক্কা ও মদিনায় যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। এ কারণে প্রথমদিকে মুসলমানরা কুরআন ও হাদিস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখতেন। শুধু তাই নয়; সেই জ্ঞানটিকে পুঁজি করে নতুন আরও জ্ঞান অন্বেষণের আশায় তারা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিক্ষাকেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপকরণের যে মৌলিক প্রক্রিয়াটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার নেপথ্যে রয়েছে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রথম যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সেখান থেকে আসা জ্ঞানের সত্যনিষ্ঠ উপকরণগুলো।[৫]

ইসলামপূর্ব আরবে পদার্থবিজ্ঞান এবং নিরীক্ষানির্ভর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা ছিল খুবই সীমিত। মিশর ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কিছু অংশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার পর তারা জুন্দাইসাপুরা, হাররান ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিভিন্ন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানার সুযোগ পায়। মুসলমানরা সেখানে প্রথমবারের মতো গ্রিক সভ্যতার রেখে যাওয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কর্মকাণ্ডগুলোর সাথে পরিচিত হয় এবং এই সংক্রান্ত আরও বেশি জ্ঞান অনুসন্ধান করার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।[৬]

অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টিকে বলা হয় মুসলিম ইতিহাসের সোনালি যুগ। মুসলমানরা এই সময়ে বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে জন্ম হয় অসংখ্য মেধাবী বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের। ইবনে সিনা, আল খাওয়ারিজমি, আল রাজি, আল জাহরাভি, আল বেরুনি, আল হাইসাম, আল ইদ্রিসি, আল কিন্দি, ইবনে খালদুন এবং আরও অসংখ্য বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও গণিতবিদ এই সময়টাতেই জন্ম নেন। তাঁদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণাকর্ম পরবর্তী সময়ের গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোলে, অর্থনীতিতে এবং দর্শনে অসামান্য অবদান রেখেছে।

সেই সময় মুসলিম বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদদের কর্মকাণ্ডগুলো তৎকালীন সময়ের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা উজবেকিস্তানের বোখারা থেকে শুরু করে ইরাকের বাগদাদ, ইরানের ইস্পাহান এবং পশ্চিমে মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েন। তারা এমন কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে ছাত্ররা এসে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভর্তি হয়েছিল। শুধু কর্ডোভাতেই ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৭০টি পাবলিক লাইব্রেরি এবং ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল লক্ষাধিক বই।[৭]

কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞানার্জন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ইবাদতের সমান গুরুত্ব দেওয়ায় মুসলিম চিন্তাবিদেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বলিষ্ঠভাবে পদচারণা করেছেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। মুসলমান বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সকল কর্মকাণ্ডের প্রভাব পশ্চিমা ভাবনায় এবং সামগ্রিকভাবে গোটা পশ্চিমা সভ্যতায় প্রবলভাবে লক্ষণীয়। মুসলমানরা যখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির স্বর্ণশিখরে অবস্থান করছিল, তখন পশ্চিমাজগৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। চার্চের কর্তাব্যক্তিরা ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে থামিয়ে রেখেছিলেন। তারা সব সময় মুক্ত চিন্তাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে—এই তথ্যটি আবিষ্কারের জন্য চার্চের কর্তাব্যক্তিরা গ্যালিলিওকে শাস্তিও প্রদান করেছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য, প্রায় ১০০০ বছরের বেশি সময় ইউরোপে বিজ্ঞানভিত্তিক বা চিকিৎসা সম্পর্কিত কাজ তেমন একটা হয়নি। বহু বছর পূর্বে গ্রিক ও রোমান শিক্ষাবিদরা যতটুকু কাজ করে গিয়েছিলেন, সেগুলোকেও ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। ৩৯০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানরা আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি পাঠাগারকে সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়ে দেন। ফলে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সময়ে আবিষ্কৃত অনেক তথ্যই সারা জীবনের জন্যই হারিয়ে যায়।[৮]

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, পশ্চিমে বরাবরই মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানগুলোকে আড়াল করে রাখা হয়। অবমূল্যায়ন করা হয়। পশ্চিমা জগতে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর যেসব গ্রন্থ ও কলাম রচিত হয়েছে, তাতে গ্রিক বিজ্ঞানীদের অবদানকে উপস্থাপন করা হয় বেশ গুরুত্বের সাথে। দাবি করা হয়, গ্রিকদের সেই অবদানের ধারাবাহিকতায় রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিমা ছাত্রদের শেখানো হয়—গ্রিক শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের ধারাবাহিকতায় ইউরোপীয় খ্রিষ্টান বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীর জন্য কার্যকর ভূমিকা রেখে গেছেন।

পশ্চিমা জগতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ওপর যে সমস্ত প্রকাশনা রয়েছে, তাতেও মুসলিম বিজ্ঞানীদের কর্মকাণ্ডকে খুব সামান্যই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মোরোয়িতজ প্রকৃত ইতিহাস আড়াল করার পশ্চিমা এই প্রচেষ্টাকে 'হিস্ট্রিজ ব্ল্যাক হোল' বা 'ইতিহাসের কালো গহ্বর' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন—

> 'এমন একটি ধারণা তৈরি করে রাখা হয়েছে, যা মানুষের সামনে বিকৃত সত্য উপস্থাপন করছে। তাদের কথা শুনলে মনে হয়, কয়েকশো বছর আগে গ্রিক ও রোমান সভ্যতা যা রেখে গিয়েছিল, তার ছাইভস্ম থেকেই ইউরোপে রেনেসাঁসের উত্থান ঘটেছে।'[৯]

তবে এত কিছুর পরও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ইতিহাসবিদ এবং বিজ্ঞান গবেষককে পাওয়া যায় (জন উইলিয়াম, ই.এ. মায়ার্স, ম্যাক্স মেয়েরহফ, ফিলিপ কে. হিট্টি, জর্জ সারটন, এম. উলম্যান, ই.জি. ব্রাউন এবং স্যাভেজ স্মিথ) যারা স্বীকার করেন, মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীরা শুধু প্রাচীন পারস্য এবং ভারতবর্ষের রেখে যাওয়া জ্ঞানকেই সংরক্ষণ করেননি; পাশাপাশি নিজেরাও জ্ঞানভাণ্ডারে অনেক মৌলিক তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানও সংযোজন করেছেন।[১০] বার্নার্ড লুইস মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তার বিখ্যাত বইটিতে দাবি করেছেন—ইসলামের সোনালি যুগে বিজ্ঞানের জগতে যে অগ্রগতি ঘটেছিল, শুধু গ্রিকসভ্যতা-লব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই তা তৈরি হয়নি।

> 'মধ্যযুগের মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চা শুধু গ্রিক জ্ঞানকে সংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন আরও সব সভ্যতা এবং দূরপ্রাচ্যে আরও যেসব জনপদ ছিল, তাদের থেকে পাওয়া জ্ঞানগুলোকে সংরক্ষণ করার মাঝেই মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। বর্তমান পৃথিবীতে মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানীদের যে অবদান লক্ষ করা যাচ্ছে, সেখানে তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং জ্ঞানভিত্তিক অবদানই মুখ্য ছিল। গ্রিক সভ্যতায় যতটুকু বিজ্ঞানের চর্চা হয়, তা ছিল অনেকটা অনুমাননির্ভর এবং তাত্ত্বিক ঘরানার।
>
> এর বিপরীতে মধ্যযুগের মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের হাত ধরে যে বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, তা ছিল অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত। চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। এভাবেও বলা যায়—প্রাচীন সভ্যতাগুলো থেকে

যে জ্ঞান এসেছিল, মুসলমানেরা সেই জ্ঞানকে আরও স্পষ্ট, পরিশীলিত এবং নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।'[১১]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলমানদের নিত্য-নতুন আবিষ্কার, মৌলিকত্ব এবং সৃষ্টিশীলতার অসাধারণ সব নিদর্শন ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে মুসলমান বিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদদের কাজগুলো পরবর্তী সময়ে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।[১২] সিসিলি ও স্পেনেই প্রথমে মুসলিমদের এসব আবিষ্কার ও নতুন নতুন তথ্যগুলো এসে জমা হতো। কালক্রমে, স্পেন থেকে দেশের বা মানচিত্রের সীমানা পার হয়ে তা পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স অবধি ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শাসক রাজা দ্বিতীয় রজার খুবই আন্তরিকভাবে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদান এবং ইসলামি সংস্কৃতিকে ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন শহরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন। ফলে এসব শহরেও সেই সময়গুলোতে নিয়মিত হতো আরবি ভাষার চর্চা।

এই অধ্যায়ে চিকিৎসাশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় সকল মনীষীর অবদানকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হবে। বিশেষ করে মুসলমানদের সোনালি যুগে মুসলিম বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদগণ যে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও মৌলিক অবদান রেখে গেছেন, সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

রাসূল ﷺ-এর ওফাতের মাত্র ২০০ বছরের মধ্যেই মুসলমানেরা নতুন নতুন অনেক ভূখণ্ড জয় করে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য আরব থেকে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত। গোটা আরব ভূখণ্ড, সিরিয়া, মিশর, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা, ইরান ও তুরস্কসহ পুরো অঞ্চলটি ছিল তখন মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে। একসময় এই ভূখণ্ডগুলো বিচ্ছিন্নভাবে শাসিত থাকলেও ধীরে ধীরে তা মুসলিম সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ফলে মুসলমানরা বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বিভিন্ন সভ্যতার আবিষ্কার সম্বন্ধে জানতে পারে।

মুসলিম শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ীরাও ভারতবর্ষ ও চীনসহ অনেক দূরবর্তী ভূখণ্ডে পর্যটক হিসেবে যেতেন এবং সেখান থেকে উক্ত অঞ্চলসমূহের জ্ঞানগুলোকে ধারণ করে নিজেদের ভূখণ্ডে ফিরে আসতেন। যদিও এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপীয় মহাদেশ প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সংস্কৃতির লালন করত, তা সত্ত্বেও একটা সময়ে এসব অঞ্চলে আরবি ভাষাই একমাত্র সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য

আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া শুরু করে। এমনকী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চার ক্ষেত্রেও আরবি ভাষাই একমাত্র সহায়ক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় ধরনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান ও তথ্যের অবাধ বিনিময় ও চর্চা শুরু হয়। বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয় বাগদাদ এবং কর্ডোভা। গণিত, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রিস, রোম, ভারতবর্ষ, পারস্য এবং সিরিয়ায় যেসব কাজ হয়েছিল, সেগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

তৎকালীন আব্বাসীয় খলিফাগণ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদের কাজের সুবিধার্থে বায়তুল হিকমা বা জ্ঞানের বসতবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। সেইসঙ্গে বাইজান্টাইন রাজ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন, যাদের কাজ ছিল উক্ত সাম্রাজ্যে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসা। আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন অনুবাদের জন্য পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক নামক একজন খ্রিষ্টান ব্যক্তিকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। হুনাইন ছিলেন স্বভাবজাত ও অনুবাদক এবং বিজ্ঞানী। তিনি অ্যারিস্টটল, হিপোক্রিটস এবং গ্যালেনের কাজগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন।

গণিতশাস্ত্র, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে বায়তুল হিকমার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আজও লক্ষ করা যায়। বায়তুল হিকমা থেকেই উত্থান হয় আল কিন্দি ও আল ফারাবির মতো প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদদের। নবম শতকের আব্বাসীয় খলিফা আল মুহতাদি সাবিত ইবনে কুররা নামক আরেকজন চিন্তাবিদকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সাবিত গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন কাজের ওপর বিস্তর গবেষণা চালিয়ে আবিষ্কার করেন গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দর্শনের ওপরে অনবদ্য কিছু তথ্য। পরবর্তী সময়ে সাবিত ইবনে কুররার ছেলে সিনান বাগদাদে অনেকগুলো হাসপাতালের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্পেনে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণ শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা মৌলিক কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম তৈরি করেছিলেন।

মুসলিম স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রবেশমুখে তখন প্রায়ই একটি লেখা পাওয়া যেত—

> ‘পৃথিবী মূলত চারটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে—শিক্ষিত লোকের জ্ঞান, কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার, নেককার বান্দাদের ইবাদত এবং সাহসী লোকদের সাহস।’[১৩]

মুসলিম স্পেনে অমুসলিম শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানীরাও ব্যাপকভাবে কাজ করার সুযোগ পেত। ইসলামে ভিন্ন ধর্মের লোকদের সহাবস্থান এবং তাদের মূল্যায়নের যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা অন্য কোথাও দেখা যায় না। মুসলিম স্পেনের উদারনীতির ধারাবাহিকতাও ছিল তৎকালীন উমাইয়া খলিফাদের সহনশীলতা এবং সহযোগিতাসুলভ মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামি সভ্যতার উত্থান এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ব্যাপারে ইসলামের সহনশীল নীতিমালা প্রসঙ্গে জন এসপোসিতো বলেন—

> ‘ইসলামি সভ্যতার মূল ভিত্তি—সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং নানা ধরনের সংস্কৃতি ও ভাষার অভূতপূর্ব সম্মেলন। পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা যেভাবে বুদ্ধিভিত্তিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল, মুসলিম সাম্রাজ্যেও তারা একই সুযোগ পেয়েছিল। সহযোগিতামূলক এই নীতিটি খলিফা মামুনের সময়ে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ‘বায়তুল হিকমা’ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হুনাইন ইবনে ইসহাক নামক একজন খ্রিষ্টান পণ্ডিতকে।
>
> অনুবাদের স্বর্ণযুগের পরবর্তী সময়েও মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে তাদের মৌলিক ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের নিদর্শন স্থাপন করে। মুসলমানরা গুরু-শিষ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞানবিদ্যার বিস্তার ঘটায়। ফলে যে ইসলামি সভ্যতার জন্ম হয়, তাতে একদিকে আরবি ভাষার আধিপত্য ছিল। আবার এ কথাও বলা যায়—জীবন সম্বন্ধে ইসলামের যে বহুমুখী দর্শন, তা-ও এই সভ্যতার ভেতর দিয়েই প্রতিফলিত হয়।’

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, পশ্চিমারা ইসলামের এই সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করে না। অথচ এ কথাও সত্য, আরবিতে অনুবাদ হওয়ার কারণেই

গ্রিক, ভারতীয় এবং ইসলামপূর্ব সভ্যতাগুলোর জ্ঞানভিত্তিক কর্মকাণ্ডগুলো সংরক্ষিত হয়েছে এবং নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আরবি অনুবাদ কর্মকেই পরবর্তী সময়ে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং সেখান থেকে তা ইউরোপে প্রবেশ করে। মুসলমানদের এই অনুবাদ এবং মৌলিক কর্মকাণ্ডগুলো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে দেয়।[১৫] মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ বাগদাদ এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের নানা স্থানে অসংখ্য মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করে—যেখানে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ থেকেও বিপুলসংখ্যক ছাত্র এসে অধ্যয়ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের মন্টিপেলিয়ার, পাডুয়া এবং পিসায় কর্ডোভার মুসলিম মেডিকেল স্কুলের আদলেই মেডিকেল স্কুল চালু হয়েছিল। চিকিৎসা শাস্ত্রের এনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনে সিনার *আল কানুন*-কেই বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, মুসলিম শৈল চিকিৎসক আবু আল কাসিম আল জাহরাবি শৈল চিকিৎসা তথা অপারেশন শাস্ত্রের ওপরে যে বইটি লিখেছেন, তা ১৬ শতক পর্যন্ত ইউরোপে নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পঠিত হয়েছে। তারপরে গিয়ে ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের লেখা এই বইগুলিকে হটিয়ে দিয়ে এগুলোর আলোকেই নিজেদের মতো করে বই রচনা করে। ফলে, পরবর্তী সময়ের ছাত্ররাও ইউরোপিয়ানদের লেখা বইগুলো থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করে।[১৬]

যেকোনো অনুমান বা অনুমানভিত্তিক ধারণাকে তাত্ত্বিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রিক বিজ্ঞানীরা ছিলেন অসম্ভব পারদর্শী। তারা পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন অনন্য, কিন্তু নিরীক্ষা চালানোর ব্যাপারে তাদের তেমন একটা সক্রিয়তা ছিল না বললেই চলে। গ্রিক সাহিত্যের যে উপকরণগুলো আমরা পেয়েছি, তাতে তাদের বিশ্লেষণধর্মী নিরীক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানব ইতিহাসে মুসলমান বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের আলোকে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেন। গ্রিকদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, অ্যারিস্টটল ও প্লেটো যা বলে গেছেন, সেটাই সঠিক এবং চূড়ান্ত। তারা বিশ্বাস করত, এই দুই মহান দার্শনিকের কোনো চিন্তা ভুল হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই দুই দার্শনিক বিভিন্ন দৃশ্যপটকে তাত্ত্বিক রূপ দেওয়া এবং তাদের অনুমাননির্ভর জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এই সব ঘটনাবলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালিয়েছেন মাত্র।[১৭]

এ প্রসঙ্গে ব্রিফল্ট বলেন—

> 'সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব রক্ষায় ভীষণভাবে আরব সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানীদের কাছে কৃতজ্ঞ। কেননা, আরব বিজ্ঞানীরাই সবচেয়ে বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ আবিষ্কার এবং বৈপ্লবিক তথ্যগুলো প্রদান করেছিলেন। এর আগে গ্রিকরা কিছু বিষয়কে পদ্ধতিগত কাঠামোর আওতায় এনে কিছু তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন, তবে রোগীর রোগের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, ইতিবাচক জ্ঞানের প্রসার, বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত কৌশল, নির্মোহ পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা বলতে ইউরোপ আজ অবধি যা কিছু শিখেছে, তার সবটাই এসেছে আরব থেকে।'[১৮]

এ পর্যায়ে আমি চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, ওষুধবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় আরব বিজ্ঞানীদের কিছু অবদান নিয়ে আলোচনা করব।

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্রে যে মৌলিক গবেষণার ইতিহাস রচিত হয়েছে, তা মূলত অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দীতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতের আমলেই সম্পন্ন হয়েছে। মুসলমানরা প্রাথমিকভাবে গ্রিকদের আবিষ্কৃত মানবদেহবিষয়ক তথ্যের ওপরই নির্ভর করে গবেষণা শুরু করেছিল। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে তারা দেখলেন, গ্রিকদের আবিষ্কৃত তথ্যে ভুলের সংখ্যা অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, গ্যালেন বলে গিয়েছিলেন—মানুষের মাথার খুলি সাতটি হাড় দিয়ে নির্মিত। কিন্তু মুসলমান বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ আবিষ্কার করেন, কানের ভেতর কিছু ক্ষুদ্র অস্থি আছে—যা মানুষের শ্রবণ সহায়ক।[১৯] পরবর্তী সময়ে ইউহানা ইবনে মাসয়াভি একটি বানরের ব্যবচ্ছেদ করে মানবদেহ সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে আল জাহরাভি প্রথম গুরুত্বসহকারে বলেন, শল্য চিকিৎসক বা সার্জন হতে গেলে অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেই হবে।

নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোটা মুসলিম বিশ্বজুড়ে অসংখ্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই হাসপাতালগুলোকে বলা হতো বিমারিস্তান। বিমার অর্থ—রোগ। অর্থাৎ রোগে আক্রান্ত হলে যেখানে থাকতে হয় সেটাই বিমারিস্তান।

মানবিক মর্যাদা, সম্মান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—এই তিনটি নীতির ওপর ভিত্তি করে হাসপাতালগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতো। ভালো মানের চিকিৎসকগণ এই হাসপাতালগুলোর পরিচালনায় থাকতেন। এর বাইরেও অসংখ্য চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র (বর্তমানের মেডিকেল কলেজের মতো) এবং বেশ অনেকগুলো গবেষণা প্রতিষ্ঠানও তখন চালু ছিল। অনেক প্রসিদ্ধ মুসলিম চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এই হাসপাতালগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইসলামের প্রথম যুগে একটি হাসপাতালের নাম ছিল মুকতাদি—যা বাগদাদে ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল রাজির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হাসপাতালে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ সার্জন এবং অর্থোপেডিক্স (হাড় সংযোজন এবং প্রতিস্থাপন) বিশেষজ্ঞ কর্মরত ছিলেন। নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা, জীবন মানের উন্নয়ন ও চিকিৎসার অগ্রগতিতে মুসলমান চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। হাসপাতাল থেকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হতো। নারী ও পুরুষ রোগীদের জন্য ছিল পৃথক ব্যবস্থাপনা। সেইসঙ্গে সাধারণ রোগী, সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়ার্ড ছিল সুরক্ষিত। প্রতিটি চিকিৎসক এবং সেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো—যাতে তারা রোগীদের মানসম্পন্ন সেবা দিতে পারে।

হাসপাতালগুলোর সঙ্গে গবেষণাগারও সংযুক্ত ছিল, যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকেরা নিয়মিতভাবে গবেষণা চালাতেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই হাসপাতালগুলো ছিল রীতিমতো প্রাসাদের মতো সজ্জিত ও গোছালো। প্রখ্যাত আরব পর্যটক ইবনে জুবায়ের বাগদাদের এই মুকতাদি হাসপাতালের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

> 'এই হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার অনন্যসাধারণ ব্যবস্থা ছিল। রোগীদের এখানে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সাথে চিকিৎসা দেওয়া হতো। প্রতিটি রোগীকে খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হতো বিনামূল্যে। রোগীরা যাতে নির্বিঘ্নে ওয়াশরুম ব্যবহার করতে পারেন, সেজন্য টাইগ্রিস নদী থেকে ওয়াশরুমগুলোতে পানির পাইপ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদগণ হাসপাতালগুলো পরিদর্শন করতেন এবং সেখানে কর্মরত চিকিৎসক ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জটিল রোগগুলোর চিকিৎসায় সহায়তা করতেন। বিশেষ করে ক্রনিক ধরনের রোগগুলোর চিকিৎসায় তারা নানা ধরনের পরামর্শ প্রদান করতেন। পাশাপাশি, হাসপাতালটিতে রোগীর সাথে থাকা অ্যাটেনডেন্টরাও হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীদের জন্য পছন্দসই খাবার রান্না এবং ওষুধ তৈরিতে সহায়তা করার সুযোগ পেতেন।'[২০]

বাগদাদের মতো বড়ো শহরগুলোতে মানসিক রোগীদের পৃথক হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হতো। মানব ইতিহাসে মানসিক রোগীদের জন্য প্রথম হাসপাতালের সন্ধান পাওয়া যায় বাগদাদে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাগদাদে এই হাসপাতালটি চালু করা হয়। পরবর্তী সময়ে দামেস্কেও মানসিক রোগীদের এসব হাসপাতালে অত্যন্ত সম্মানের সাথে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। মানসিক রোগীদের অস্থিরতা ও নানা ধরনের বিড়ম্বনাকে মুসলমান চিকিৎসাবিদরাই সর্বপ্রথম মানসিক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এর আগ পর্যন্ত এ ধরনের মানসিক রোগীদের ডাইনি বা ভূতে ধরা রোগী হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকী ইউরোপেও মানসিক রোগীদের ভূতে ধরা হিসেবে গণ্য করে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। অথচ বাগদাদের মানসিক হাসপাতালগুলোতে তৎকালীন মুসলিম শাসকেরা বিপুল পরিমাণে ওষুধ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন। ইউরোপে সর্বপ্রথম মানসিক হাসপাতাল তৈরি হয় ১৭৯৩ সালে। ফিলিপ্পো পিনেল ফ্রান্সে এই হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য শহরেও এমন হাসপাতাল তৈরি হয়; অথচ এর প্রায় ৯০০ বছর আগেই মুসলিম সাম্রাজ্যে এই ধরনের মানসিক হাসপাতাল চালু করা হয়েছিল।

মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ সর্বপ্রথম স্বাস্থ্যসেবাসংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন এবং তার আলোকে ডাক্তার ও ফার্মাসিস্ট লাইসেন্স প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে ইউরোপের সিসিলিতে এই ধরনের বিধান চালু করেন রাজা দ্বিতীয় রজার। এই বিধানটির মধ্য দিয়ে আগ্রহী চিকিৎসকদের চিকিৎসা করার আগেই নির্দিষ্ট একটি পরীক্ষায় পাশ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। মুসলমানরা চালু করার বহুদিন পর ইউরোপের মধ্যে ইতালিতে প্রথম এই জাতীয় নিয়মগুলো চালু হয়। পরবর্তী সময়ে স্পেন ও ফ্রান্সেও এর প্রচলন শুরু করে।

প্রথমে মন্টপেলিয়েরে এবং পরে সালেরনোতে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে তা গোটা ইউরোপেই ছড়িয়ে পড়ে। ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন কলেজ অফ ফিজিশিয়ানসের উদ্যোগে ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন করা হয়—যেখানে ওষুধগুলোকে একটি নিয়মের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এই কাজটি করার জন্য ইউরোপিয়ানরা অবশ্য মুসলমান ও গ্রিক চিকিৎসাবিদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ইউরোপিয়ানদের এই ক্লাসিক কাজটিতে বেশ কিছু মুসলিম ও গ্রিক চিকিৎসাবিদের নামও পাওয়া যায়। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—হাইপোক্রিতেস, গ্যালেন, অ্যাভেসিনা (ইবনে সিনা) এবং মেসিউ (ইবনে জাকারিয়া বিন মাসায়ি)।[২১]

মুসলিম শল্যচিকিৎসাবিদগণ অপারেশন করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কৌশলও প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন—যা প্রযুক্তিগত দিক থেকে ছিল অনেকটাই অগ্রসর। বিশেষ করে চোখের ছানি অপারেশন করার ক্ষেত্রে তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি সাধন করেছিলেন। অপারেশনের ক্ষেত্রে তারা চালু করেন কষ্টিদহন প্রক্রিয়া। সেইসঙ্গে তারা অনেকগুলো রোগও শনাক্ত করেন, যেগুলো এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে জহুর ট্র্যাকিওটোমি কীভাবে করা যাবে—তা বর্ণনা করে যান।

অন্যদিকে, দশম শতকের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আল জাহরাভি অপারেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় অনেকগুলো যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বিশেষ করে কানের ভেতর বিভিন্ন পরীক্ষা, মূত্রনালির ভেতরে পরীক্ষা কিংবা গলার ভেতরে কিছু আটকে গেলে তা বের করার যন্ত্রগুলো তারই আবিষ্কার। এ ছাড়া সার্জারি অপারেশনের ওপর তার লেখা বইটিতে তার ব্যবহৃত সকল যন্ত্র ও কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায়, অপারেশনের সময় রোগীকে অজ্ঞান বা এনেসথেসিয়া করার যে বিধান রয়েছে—তা-ও মুসলিম চিকিৎসাবিদরাই সর্বপ্রথম সূচনা করেন।

মুসলিম চিকিৎসাবিদগণই প্রথমবারের মতো মেডিকেল টেক্সটবুক (চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তক) রচনা করেন। এমনভাবে এই টেক্সটবুকগুলো রচিত হয়, যাতে মেডিকেলের ছাত্ররা তাদের নিয়মিত পড়াশোনা এবং গবেষণায় এই বইগুলোকে ব্যবহার করতে পারেন। টেক্সটবুকগুলোতে প্রাচীন গ্রিক এবং অন্যান্য সভ্যতার যেমন কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছিল, একই সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে মুসলমান চিকিৎসাবিদদের আবিষ্কারগুলোকেও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন আল রাজি (রেজেস, ৯৩২), আল জাহরাভি (১০১৩) এবং ইবনে সিনা (অ্যাভেসিনা, ১০৯২)।

আল রাজি হলেন পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানী, যিনি হাম ও গুটিবসন্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে খাদ্যাভাস এবং ডায়েটিং রুটিনের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিয়েও তিনি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকশো বছর পর এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি—ডায়বেটিস, হাইপারটেনশন এবং হৃদ্‌রোগসহ নানা রোগের চিকিৎসায় খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ ডায়েটিংকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

আল রাজির লেখা বইগুলো প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেগুলো ১৬ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন মেডিকেল স্কুলে পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হতো। অন্যদিকে ইবনে সিনার এনসাইক্লোপিডিয়ামূলক কাজ *কানুন ফি-আল তিব্ব* গ্রন্থে প্রাচীন সকল সভ্যতা এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের আমলে আবিষ্কৃত চিকিৎসাসংক্রান্ত সকল তথ্যকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি মাটি ও পানির মাধ্যমে যক্ষ্মা এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা করে গেছেন। তাঁর বইতে ছিল তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত ৭৬০টি ওষুধ সম্বন্ধেও বিস্তারিত তথ্য। তাঁর এই লেখাগুলোকে পরবর্তী সময়ে অনুবাদ করেই ইউরোপের মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তী কয়েকশো বছর পাঠ্য হিসেবে অধ্যয়ন করেছে।

ইবনে সিনার পাশাপাশি আল রাজিও চোখের বিভিন্ন অংশ সমন্ধে বর্ণনা করেন এবং জানান, চক্ষু গোলকের যে নড়াচড়া—তা মূলত চক্ষু পেশির সংকোচন-প্রসারণের কারণে হয়ে থাকে। মুসলমান শল্যচিকিৎসক বা সার্জনরাই সর্বপ্রথম চোখের ছানি অপারেশন করেন। এ ছাড়া মানুষ কীভাবে দেখে অর্থাৎ মানুষের দর্শন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বপ্রথম যিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদান করেন, তিনি হলেন আল হাইসাম (৯৫৬-১০৩৮)। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয় এবং তার ভিত্তিতেই মানুষ দেখতে পায়। মানুষের চোখ থেকে আলোর প্রতিফলন হয় না; যদিও এর আগে গ্রিক বিজ্ঞানী ইউক্লিড ও টলেমি তেমনটাই বলে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বর্ণনা করেন, কীভাবে বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে যাওয়ার পরে তা চোখের ভেতর দিয়ে অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছায়। সেখান থেকেই মানুষ বস্তুটির সম্বন্ধে ধারণা করে নেয় অথবা এভাবে বলা যায়—মানুষ এভাবেই একটি বস্তুকে চিনতে পারে।[২২]

আবু আল কাশেম আল জাহরাভি ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বিবেচনা করা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন চিকিৎসক হিসেবে।

তিনি প্রাচ্য ও প্রাচীন যুগের তথ্যগুলোকে সমন্বিত করে মেডিকেলের উপযোগী যে বইটি রচনা করে গিয়েছিলেন, তা পরবর্তী সময়ে ইউরোপিয়ানদের শল্যচিকিৎসা তথা অপারেশন কার্যক্রমের কাঠামো নির্মাণ করে দেয়—যা পরবর্তী সময়ে রেনেসাঁস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তিনি বেশ কিছু বিখ্যাত বই রচনা করেছেন, যার অন্যতম হলো *আল তাসরিফ*। ৩০ খণ্ডের এই বইটিতে তিনি অতীতের সকল নামকরা শল্যচিকিৎসকদের উদ্ভাবিত কৌশল এবং তার নিজের অপারেশন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী লিখে যান। বইটির শেষাংশে অপারেশনের কাজে লাগে এ রকম ২০০টি যন্ত্রের ছবি দেওয়া হয়। ফলে এই বইটি অপারেশনের ওপর পৃথিবীতে প্রথম ছবিসংবলিত বই হিসেবে পরিচিত। পরবর্তী ৫০০ বছর ইউরোপে সার্জারিসংক্রান্ত সকল কাজে এই বইটিই ছিল মূল উপজীব্য গ্রন্থ।[২৩]

মুসলিম চিকিৎসাবিদরাই সর্বপ্রথম ফুসফুস ও শ্বাসনালির কাঠামোগত বিবরণী বর্ণনা করেন। সেইসঙ্গে মানুষের ফুসফুসে শরীরের রক্তনালি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের যে যোগসূত্র, তা-ও তিনি নির্ণয় করেন। ইবনে আল নাফিস (১২১৩-১২৮৮) হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি অ্যারোটিক ও পালমোনারি নামক দুটি বৃত্তাকার পদ্ধতিকে বর্ণনা করেন। তারও প্রায় ৩০০ বছর পরে হার্ভে এই বিষয়ে তথ্য আবিষ্কার করেন। অথচ দুঃখজনকভাবে হার্ভের নামটিই এক্ষেত্রে বেশি উচ্চারিত। আল নাফিস হৃৎপিণ্ডে বিভিন্ন ধমনির ভূমিকার ওপরও আলোকপাত করেন।

রসায়নশাস্ত্র

মুসলমানরা সর্বপ্রথম রসায়নশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে সমৃদ্ধ করে। ইংরেজিতে রসায়নশাস্ত্রকে বলা হয় কেমিস্ট্রি—যা আরবি আলকেমি শব্দ থেকে উদ্ভূত। এখানে উল্লেখ্য, মুসলমানদের মধ্যে যারা যেকোনো লৌহজাত পণ্যকে সোনায় রূপান্তর করতে পারতেন, তাদেরই প্রাথমিকভাবে আলকেমিস্ট হিসেবে অভিহিত করা হতো। আরবি আল শব্দটি হলো ইংরেজি আর্টিকেল 'দি'-এর প্রতিরূপ আর 'কেমি' মানে হলো কেমিস্ট্রি। আলকেমি হলো রসায়ন। তবে প্রকৃত সত্য হলো—আলকেমি বা আলকেমিস্ট বলতে এ রকম বস্তুর রূপান্তরকারীদের বোঝানো হতো না; বরং স্বতন্ত্রভাবে রসায়নবিদদেরই বোঝানো হতো।[২৪]

মুসলিম যুগের আগে ধারণা ছিল, যেকোনো পণ্যকেই কিছু প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব। তবে মুসলমান বিজ্ঞানীরা এসে এই ধারণাকে নাকচ করে দেন। অষ্টম শতকে ইরাকে জাবের ইবনে হাইয়ান নামক একজন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়—যাকে অভিহিত করা হয় রসায়ন শাস্ত্রের জনক হিসেবে। তিনি সর্বপ্রথম স্ফটিকীকরণ, দ্রবীভূতকরণ বাষ্পকরণ, পাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসায়নশাস্ত্রে নিরীক্ষামূলক গবেষণার সূচনা করেন। একই সঙ্গে তিনি অনেকগুলো খনিজ ও এসিড উপাদান আবিষ্কার করে—যেগুলোকে তিনি প্রথমবারের মতো ব্যবহারও করে যান। জাবের তিন ধরনের বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ মৌলিক উপকরণসমূহকে নির্ণয় করেন। প্রথমত, স্পিরিট। যেমন : ক্যামফোর ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড—যেগুলোকে তাপ দিয়ে বাষ্পীকরণ করা যায়। দ্বিতীয়ত, কঠিন পদার্থসমূহ। যেমন : সোনা ও রুপা। আর তৃতীয়ত হলো, লোহা—যাকে পাউডারে পরিণত করা যায়। তিনি দুই হাজারেরও বেশি গবেষণামূলক রচনাও লিখে যান।

জাবের ইবনে হাইয়ান ছাত্রদের সব সময় পরামর্শ দিতেন—যাতে কোনো বিষয়ে নিজেরা গবেষণা করে তারা কোনো বিষয়কে সত্য বলে ধরে না নেয়। তিনি বলেন—

> ‘একজন রসায়নবিদের জন্য বাস্তবে কাজ করতে গেলে সবচেয়ে জরুরি—পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ। কোনো উপকরণকে সরাসরি প্রয়োগ না করে এবং তার ওপর গবেষণা না করে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়।’[২৫]

ডেভিড তাসনাজ এই জাবের ইবনে হাইয়ান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন—

> ‘রসায়নশাস্ত্রে জাবের যেসব কাজ করে গেছেন, তাঁকে তার সবগুলোকেই ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে ইউরোপে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী কয়েকটি শতাব্দী পর্যন্ত এগুলোর ওপর নির্ভর করেই ইউরোপিয়ান রসায়নবিদেরা—বিশেষ করে ভিলানোভার আর্নল্ড (১২৪০-১৩১৩), রজার বেকত (১২১৪-১২৯৪) এবং অ্যালবার্ট ম্যাগনাস (১১৯৩-১২৮০) কাজ করে গেছেন। এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই রসায়ন ও ওষুধশিল্পে ব্যবহৃত অনেক উপকরণের নাম ইউরোপীয় ভাষায় সরাসরি প্রবেশ করে। যেমন : আলকালি সিরাপ, জুলেপ এবং আলকেমি প্রভৃতি। এই বহুল প্রচলিত ও পরিচিত নামগুলোর মাধ্যমে রসায়ন শাস্ত্রের উন্নয়নে মুসলমানদের অবদানগুলোকে অনুধাবন করা যায়।’[২৬]

নবম শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল রাজি একজন মেধাবী রসায়নবিদও ছিলেন। তিনি পাতন এবং ঊর্ধ্বপাতনের প্রক্রিয়াকে নতুন করে ঢেলে সাজান। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় পারদ এবং এই জাতীয় উপাদানের ব্যবহার শুরু করেন। ইবনে সিনাও রসায়নশিল্প নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে ইবনে জাবিরের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করেন এবং এভাবেই তিনি নতুন নতুন ওষুধও তৈরি করেন।

প্রখ্যাত ফরাসি প্রাচ্যবিদ গোস্তাভে লে বন ইউরোপের রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশে মুসলমান বিজ্ঞানীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন—

> 'আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত, রসায়নশাস্ত্র বা বিজ্ঞানের অন্য কোনো খাতে যত আবিষ্কার আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কোনো কিছুই হুট করে হয়নি। আরবরা আরও ১০০০ বছর আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেই গবেষণাগারগুলোতে তারা চালিয়েছিল নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও পরীক্ষা। সেইসঙ্গে সেখান থেকে তারা বেশ কিছু গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও প্রকাশ করেছিল—যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে রসায়ন শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা "ল্যাভেসিয়ের" রসায়ন নিয়ে এত কাজ করতে সক্ষম হন। আরবদের সেই অবদান ছাড়া তার পক্ষে এ কাজগুলো করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ধরনের আশঙ্কা ছাড়াই বলা যায়—মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক রসায়নশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন নানা ধরনের আবিষ্কার করে যাচ্ছে।'[২৭]

ওষুধসংক্রান্ত বিজ্ঞান

মুসলমান চিকিৎসাবিদগণ ওষুধশিল্পেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁরা শুধু কিছু হারবাল ওষুধই তৈরি করেননি; বরং পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, বিশুদ্ধকরণ, নিষ্কাশন, স্ফটিকীকরণ, জমাটকরণ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন ওষুধ প্রস্তুত করেন। প্রখ্যাত চিকিৎসক আল জাহাবি (৯৩৬-১০৩৫) সহজ পন্থায় কার্যকর চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই দক্ষ। তাই তাঁকে ফার্মাসিস্ট সার্জন হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ১৩ শতকে মুসলিম স্পেনের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আল বেইতার আফ্রিকা, ভারত এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ এবং এ সমস্ত জায়গা থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন।

তিনি গাছপালাকে বর্ণমালার অক্ষর অনুযায়ী ক্রমবিন্যাস এবং একই সঙ্গে গাছগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং এদের ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কেও তথ্য দেন। তিনি বিভিন্ন গাছের আরবি ও বার্বার নাম সংযুক্ত করেন এবং কীভাবে এই গাছগুলো থেকে ওষুধ তৈরি করা যাবে, তা-ও বর্ণনা করেন। তিনি নতুন দুই শতাধিক গাছ আবিষ্কার করেন—যেগুলো সম্বন্ধে এর আগে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। তার বিখ্যাত বই *কিতাব আল জামিল ফি আল আদভিয়াহ আল মুফরাদাহ* (A Compendium of Simple Drugs and Foods) ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং লন্ডনে প্রথম ফার্মাকোপিয়া তৈরি করার সময় এই বইটিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়। উল্লেখ্য, রাজা প্রথম জেমসের সময় ফিজিশিয়ান কলেজের মাধ্যমে এই ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন করা হয়।[২৮]

লিভে'র মতে—

> মুসলমানের উৎকৃষ্টমানের জ্ঞানসাধক এবং ওষুধসংক্রান্ত মুসলমানদের কাজগুলো এতটাই সযতনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, পরবর্তী সময়ে এই কাজগুলো স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে কর্মরত সকলেরই কাজে এসেছে।[২৯]

গণিত

মুসলমানরা গণিতশাস্ত্রে অসামান্য কিছু আবিষ্কার করে গেছেন—যা পরবর্তী সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানে সংযোজিত হয়েছে এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই প্রাক-আধুনিক ইউরোপে রেনেসাঁসও সংঘটিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শূন্য সংখ্যাটির আবিষ্কার। পার্সিয়ান শিক্ষাবিদ আল খাওয়ারিজমি নবম শতকে বাগদাদে বায়তুল হিকমায় কাজ শুরু করেন। তিনি অ্যালগোরিদমের (গাণিতিক পরিভাষা) বেশ কিছু ধারণাকে উন্নত করেন। বের করেন হিসাব-নিকাশের নতুন নতুন প্রক্রিয়া। অ্যালজেবরা (বীজগণিত) নিয়ে তিনি যে কাজ করে গেছেন, তা রীতিমতো অসাধারণ। তিনি লিনিয়ার (রৈখিক সমীকরণ) এবং চতুষ্কোণতুল্য সমীকরণের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছেন। এই কারণে তাকে অ্যালজেবরার জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এই অ্যালজেবরা শব্দটি এসেছে আল খাওয়ারিজমি প্রখ্যাত বই *আলজাবের ওয়া আল মোকাবালাহ (The Compendium of Calculation by Completion and Balancing)* থেকে। এই বইতে আল খাওয়ারিজমির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থান পেয়েছে এবং ধারণা করা হয়—অ্যালজেবরা বিষয়ে এটাই বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ। আল খাওয়ারিজমি ভারত থেকে শূন্য সংখ্যার বিষয়ে ধারণা গ্রহণ করেন—

যা ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়। ভারতীয়রা শূন্য বোঝানোর জন্য জায়গাটিতে একটি শূন্যস্থান রেখে যেত। শূন্য বা জিরো বলতে আমরা বর্তমানে যে চিহ্নটিকে (0) বুঝি, তা প্রণয়ন করেন আল খাওয়ারিজমিই। এমনকী সত্যি কথা হলো—ইংরেজিতে যে জিরো শব্দটি রয়েছে, তা-ও আরবি 'সিফর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। পরবর্তী সময়ে লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি আরবি সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং ইউরোপে সেই সংখ্যাতত্ত্বের প্রচলন ঘটান।[৩০]

আবু আল ওয়াফা আল বুজ্জানি ত্রিকোণমিতির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রথম গোলাকার ও ত্রিভুজ বোঝানোর ক্ষেত্রে সাইন চিহ্নটি ব্যবহার করেন।[৩১] ১৩ শতকের ত্রিকোণমিতির ধারণাকে আরও উন্নত করেন মুসলিম বিজ্ঞানী আল তুসি। তিনি মোট ছয়টি মৌলিক ফর্মুলা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে ত্রিকোণমিতির গোলাকারসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয়। পাশাপাশি, এর মাধ্যমে গোলাকার এবং ডান কোণযুক্ত ত্রিভুজসংক্রান্ত সমস্যারও সমাধান করা যায়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান/জ্যোতির্বিদ্যা

দশম শতকের প্রখ্যাত মুসলিম জোতির্বিজ্ঞানী আল বাত্তানি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু অবদান রেখে যান। তিনিই প্রথম সৌরবর্ষ নির্ণয় করেন, যার মেয়াদ হবে ৩৬৫ দিন ৪ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। তিনি নতুন চাঁদ দেখার অত্যন্ত কার্যকর একটি পন্থা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে ইউরোপিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়েই ১৭৪৯ সালে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশ এবং চাঁদের গতি-প্রকৃতিবিষয়ক নতুন কিছু তথ্য দেন।

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম কম্পাস আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর পরিধি ২৪ হাজার মাইল—এই তথ্য সর্বপ্রথম আল ফারগানিরই আবিষ্কার। মুসলমানরাই প্রথম পেন্ডুলাম ব্যবহার করেন। তাঁরা মানমন্দির নির্মাণ, ম্যাপের ক্যাটালগ প্রণয়ন এবং দৃশ্যমান তারাগুলোর গতিপথ আবিষ্কার করেন। এর আগে সূর্য ও চাঁদের গতিপথ সম্বন্ধে যে টেবিলটি প্রণীত হয়েছিল, মুসলমানরা তাতেও প্রয়োজনীয় সংশোধন আনেন।

মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সৌরকলঙ্ক, সূর্যগ্রহণ এবং ধূমকেতু বিষয়েও পর্যবেক্ষণ রেখে যান। মুসলমানরাই জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং জ্যোতিষশাস্ত্রকে ঠিক বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে বরং বিজ্ঞানের অবয়বে অপবিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

১৩ শতকের মুসলমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল তুসি সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত টেবিল প্রণয়ন করেন যাকে আল-জিয ইলখানি নামে অভিহিত করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে এই টেবিলটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হিসেবে পরিচিত। আল তুসি ইতঃপূর্বে টলেমির প্রদত্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত তথ্যে সীমাবদ্ধতাগুলো শনাক্ত এবং সেই সীমাবদ্ধতার জায়গা থেকে কোপার্নিকাসও বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেন।

দশম শতকে মুসলমানরা বাগদাদে মানমন্দির নির্মাণ করে। এরপর ১৩ শতকে সমরখন্দে আরেকটি মান মন্দির নির্মাণ করা হয়। সেখানেই আল তুসি বিভিন্ন গ্রহের গতিপথের মাত্রা নির্ধারণে ব্যাপক কাজ করেন। চৌদ্দ শতকে দামেস্কে ইবনে শাইতার একইভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিপথ নিয়ে গবেষণা এবং সঞ্চরণশীল গতিপথের ব্যাপারে একটি বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। প্রখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস ইবনে শাইতারের পর্যবেক্ষণকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার এবং তার তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গ্রহগুলোর গতিপথের হেক্টোকেন্দ্রিক পদ্ধতি সম্বন্ধে মতামত প্রদান করেন—যা ইতঃপূর্বে গ্রিক জোতির্বিজ্ঞানী টলেমির ভূকেন্দ্রিক পদ্ধতির একেবারেই বিপরীত।[৩২]

ভূগোল

দশম শতকের প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবেত্তা আল মাসুদি বাগদাদ, ভারত, চীন এবং পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। এই সব অঞ্চলের মানুষ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু রচনা রেখে যান। তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত এবং এর ওপরে ৩৪ টি বই রচনা করেন।

১১ শতকে উজবেকিস্তানে আল বিরুনি নামে আরেকজন মুসলিম চিন্তাবিদের জন্ম হয়। তিনিও ভ্রমণ বিষয়ে তৈরি করেন অসামান্য কিছু রচনাবলি। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় যেসব ইতিহাস এবং মানুষের দেখা পান, তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য এই গ্রন্থগুলোতে লিখে রাখেন। তিনি ভারতীয় ও সংস্কৃতি ভাষায় রচিত অনেকগুলো বইকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর হাত দিয়েই ভারতীয় উপমহাদেশে রচিত কর্মকাণ্ডগুলো আরবি ভাষায় পরিচিত হতে শুরু করে।

১২ শতকে দক্ষিণ স্পেনের প্রখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ আল ইদ্রিসি প্রথমে কর্ডোভায় পড়াশোনা এবং তারপর স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, আনাতোলিয়া ও ইউরোপের অনেক জায়গায় ভ্রমণ করেন। পরিশেষে, তিনি সিসিলিতে বসত গড়েন এবং বর্ণনামূলক ভূগোলের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বই রচনা করেন, যার নাম হলো—*কিতাব নুজুহাত আল মুসতাক ফি ইখত্রাক আল আফাক* (*The Pleasures of Travel by One who is Eager to Traverse the Regions of the World*) আল ইদ্রিসি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের অভ্যাস ও প্রথা সম্পর্কে বর্ণনা এবং সেইসঙ্গে আবিষ্কৃত পৃথিবীর বিভিন্ন পরিচিত শহরগুলোর মধ্যকার দূরত্ব নিরূপণ করেন। তিনি রুপার একটি কাঠামো নির্মাণ করে তার ওপর অঙ্কন করেন পৃথিবীর মানচিত্র। একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করেন।[৩৩]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

যদিও পশ্চিমে এই বিষয়ে তখনও অবধি খুব একটা স্বচ্ছ জ্ঞান ছিল না, তবে মুসলমান চিন্তাবিদরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উন্নয়নে প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছেন এবং ইসলামে রাজনীতির ভূমিকাও নির্ধারণ করেছেন। ১১ শতকে জন্ম নেওয়া আল মাওয়ার্দি ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বিচারক ও সমাজচিন্তক। তিনি খলিফা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারের যে সম্পর্ক—তা নিয়ে বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে যান। তিনি খলিফা নির্বাচন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং বলিষ্ঠভাবে দাবি করেন, তৎকালীন সময়ে শরিয়াহ সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণাগুলো ছিল, তা দিয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনিই শরিয়াহর কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ধারণার সংযোজন করেন।[৩৪]

সমাজবিজ্ঞান

চৌদ্দ শতকের প্রখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল মুকাদ্দিমা* (ইন্ট্রোডাকশন) রচনা করেন—যা ইতিহাসের ওপরে লেখা প্রথম একটি দার্শনিক গ্রন্থ। এই বইটি তাঁকে বিশ্বসেরা ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। তিনি বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক বিষয়াদিকে চিহ্নিত করেন—

যার ওপর ভিত্তি করে মানবসভ্যতা এই অবধি অগ্রসর হয়েছে। তিনি মানবসভ্যতার একটি চক্রাকার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন—যেখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে পরিবর্তনশীল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক নিয়ামকের ওপর ভিত্তি করে মানবসভ্যতায় চক্রাকার বিবর্তন সংঘটিত হয়। ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ওপরে তিনি যা লিখে গেছেন, তার ওপর ভিত্তি করেই উন্মোচিত হয় সমাজবিজ্ঞান নামে জ্ঞানচর্চার নতুন একটি শাখা। ইতিহাসের একজন রচয়িতা হিসেবে কিংবা ইতিহাস বিজ্ঞানের একজন দার্শনিক হিসেবে ইবনে খালদুনের সমতুল্য কোনো ব্যক্তি পরবর্তী কোনো সময়ে কিংবা কোনো দেশে আর দেখা যায়নি।[৩৫]

দর্শন

মুসলিম দার্শনিকরা বরাবরই গ্রিক দার্শনিকদের কাজকে মূল্যায়ন করতেন। বিশেষ করে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল যা লিখে গেছেন, সেই বিষয়গুলোকে পরবর্তী সময়ের মুসলমানরা বরাবরই বিবেচনায় নিয়েছেন। নবম শতকে আলকিন্দি নামের একজন মুসলিম দার্শনিকের আবির্ভাব হয়—যাকে 'ফিলোসফার অব দি আরব' বা 'আরবের দার্শনিক' হিসেবে অভিহিত করা হতো। তিনি মত দেন—দর্শন কখনো ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নয়; বরং দর্শনের মধ্য দিয়ে ধর্মকে (ইসলাম) আরও ভালো অনুধাবন করা যায়। আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক আল ফারাবি দশম শতকে বিমূর্ত জ্ঞান (Abstract Knowledge) প্রসঙ্গে তাঁর মতামত পেশ এবং ইসলামি দর্শনের আওতায় থেকেই নব্য প্লেটোনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্লেটোর রিপাবলিক কাঠামো অনুসারে একটি মডেল শহরের প্রস্তাবনাসংবলিত গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে তিনি দেখিয়েছেন—ইসলামি কাঠামোর সীমানায় থেকেই এই ধরনের শহর বা রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। পাশাপাশি, তিনি যুক্তিবিদ্যাবিষয়ক অধ্যয়নকে সহজ করার জন্য এটিকে দুই ভাগে ভাগ করেন। একটি হলো চিন্তা, আর দ্বিতীয়টি প্রমাণ।

এগারো শতকের প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ আল গাজালি বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি অসীমতাকে ধারণ করার ক্ষেত্রে যুক্তির সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেন এবং দাবি করেন, অনন্ত সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক যেকোনো বিষয় অনন্ত স্থানের সাথেও সংগতিপূর্ণ। তিনি ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সাংঘর্ষিক বিষয়াবলিকে সীমাহীন এবং সীমাবদ্ধ ধারণার মধ্যে আটকে রাখতে সক্ষম হন।

১২ শতকে মুসলিম স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশদকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনিও ধর্ম এবং দর্শনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারিগর। তার মতে—মানুষ পুরোপুরি তার নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, আবার নিয়তিও পুরোপুরি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি দাবি করেন, দর্শন কখনোই ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্বৃত করে তিনি প্রমাণ করেন, ইসলাম বরং দর্শনচিন্তাকে সমর্থন করে।

ইবনে রুশদের দর্শন দ্বারা ১৩ শতকে খ্রিষ্টান দার্শনিক সেইন্ট থমাস আকুইনাস ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। সেন্ট থমাস আকুইনাস সর্বপ্রথম ক্যাথলিক চিন্তা-দর্শনের প্রবর্তক। সেইসঙ্গে তিনি অ্যারিস্টটল, সেইন্ট অগাস্টিন, গাজালি এবং ইবনে রুশদের দর্শনের মাঝেও সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম *সুম্মা থিওলজিকা*—যেখানে তিনি গাজালির *এহইয়াউ উলুমুদ-দ্বীন* (Revival of the Science and Religion) প্রদত্ত চিন্তাধারাকে অনুসরণ এবং এই চিন্তাদর্শনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দর্শন ও বিশ্বাসের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। সেইন্ট থমাস ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে ভারসাম্য পর্যবেক্ষণ করেন, তার মূল উৎসই ছিল মুসলিম স্পেনের উন্নত সংস্কৃতি এবং ইবনে রুশদের দর্শনসংক্রান্ত অনবদ্য সব লেখনী।

১৩ শতকের আরেকজন প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ছিলেন ইবনুল আরাবি, যিনি অসংখ্য টুকরো টুকরো এবং এককেন্দ্রিক অপ্রকাশ্য চিন্তাধারাকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করেন এবং একক একটি তত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করান। তাঁর বই *ফুসুস আল হিকাম* সুফিজমের ওপরে লেখা অন্যতম সেরাগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

১৩ শতকের আরেকজন মুসলিম দার্শনিক হলেন রুমি। পশ্চিমা জগতে অবশ্য রুমি বেশ ভালোভাবে পরিচিত। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম *মসনবি*—যেখানে অধিবিদ্যা, ধর্ম, নৈতিকতা এবং রহস্যবাদের বিষয়সংক্রান্ত অনেকগুলো জটিল সমস্যাকে তিনি সমাধান করে গেছেন। তিনি সুফিজমের বেশ কিছু তাত্ত্বিক ধারণা ও মতবাদকে ব্যাখ্যা এবং পার্থিব জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কও নিরূপণ করেছেন।[৩৬]

প্রযুক্তিবিদ্যা

প্রযুক্তি খাতে মুসলমানদের অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। মুসলমানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি অর্জন হচ্ছে কাগজের আবিষ্কার। মূলত চীন থেকে ধারণা নিয়ে মুসলমানরা নিজেদের মতো করে কাগজ উৎপাদন শুরু করে। প্রথমদিকে সমরকন্দে এবং পরবর্তী সময়ে বাগদাদ ও সিরিয়াতে কাগজ উৎপাদন করার কারখানা চালু হয়।[৩৭] অষ্টম ও নবম শতকে এই ধরনের পেপার মিল স্পেন থেকে শুরু করে ইরান পর্যন্ত—অর্থাৎ গোটা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়। ইউরোপে প্রথম কাগজ উৎপাদন কারখানা তৈরি হয় ১৩ শতকে এসে। কাগজের আবিষ্কারের কারণে পাতা ও পাথরের ওপর খোদাই করে লেখার সমাপ্তি ঘটে এবং অর্জিত জ্ঞানকে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে রাখা সম্ভব হয়। শিক্ষাখাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। পাশাপাশি, শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নবম শতকে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু স্কুলে বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচিও পালন করা হয়।

পেপার মিলের পাশাপাশি সিরিয়ায় গ্লাস বা কাচ উৎপাদনের জন্য কলকারখানাও চালু হয়। ওইসব কারখানা থেকে উৎপাদন করা হয় নানা ধরনের কাচের পণ্য এবং তৈজসপত্র। মুসলমানদের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি ১২ শতকে ভেনিসে রফতানি হয়। এখনও ভেনিসেই ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উন্নতমানের কাচ উৎপাদন করা হয়।

মুসলমানরা তন্তু, সুতা, কাপড় এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনেও সফলতা অর্জন করে। নবম-দশম শতকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো থেকে আসা অনেক জাহাজকে প্রায়শই চীনের ক্যান্টন বন্দরে নোঙর ফেলতে দেখা যেত। মুসলিম ব্যবসায়ীরা চেক ব্যবহারের পাশাপাশি এলসি খুলে ব্যাবসা করার প্রক্রিয়া চালু করে। মুসলিম ব্যবসায়ীরা সব ধরনের পণ্য বিশেষ করে সোনা, রুপা, লোহা এবং স্টিলের নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করে।

মুসলমানরাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজের সূচনা করে এবং তারাই প্রথম সার ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।[৩৮] ১২ শতকে মুসলমানরা কৃষি, সেচ এবং পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রগতি সাধন করে। মুসলমানদের উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি পরবর্তী সময়ে স্পেন হয়ে ইতালি এবং তারও পরে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।[৩৯]

এই প্রসঙ্গে ফিলিপ কে হিট্টি বলেন—

> 'মধ্যযুগের প্রথম দিকে আরবরা মানবসভ্যতার উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করেছিল, তার সমান্তরাল ভূমিকা আর কেউ পালন করতে পারেনি। নবম থেকে ১২ শতাব্দী পর্যন্ত আরবি ভাষায় দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ভূগোল বিষয়ে যত বেশি রচনা লিখিত হয়েছে, আর কোনো ভাষায় ততসংখ্যক রচনা পাওয়া যায় না।'[৪০]

উপসংহার

এই অধ্যায়ে বিশ্ব সভ্যতার উন্নয়নে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদানগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, মুসলমানদের এই ধরনের কার্যক্রমগুলো পরবর্তী সময়ে ক্রমাগতভাবে কমতে শুরু করে। এরপর একটা পর্যায়ে মুসলমানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলার কারণে বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাও ক্রমশ স্থবির হয়ে যায়। কালক্রমে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে মুসলমানদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ কমতে থাকে।

১৪০২ সালে ফার্ডিনান্ড যখন স্পেন জয় করেন, তখন আরবি ভাষায় লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক হাজারো গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়। স্পেন দখলকারীরা মুসলমানদের ব্যাপারে এত বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল, তারা আরবি ভাষায় লেখা সব ধরনের বই পাঠকদের জন্য নিষিদ্ধ করে। ফলে পাঠকরা মুসলিম দার্শনিকদের লেখা অধিকাংশ বই পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তারা কেবল সেই বইগুলোই পড়তে পারতেন, যেগুলো এরই মাঝে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে গিয়েছিল। ১৩ শতকে মঙ্গলরা বাগদাদে আরেক দফা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে মুসলমান লেখকদের লেখা সকল বই ধ্বংস করে। ১২ এবং ১৩ শতকে সিরিয়াতে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা মুসলিম বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের অনেক রচনাবলিকেও একইভাবে নষ্ট করে দেন।

ইউরোপের অনেক অমুসলিম নাগরিকেরা ইতঃপূর্বে রচিত মুসলিম চিন্তাবিদদের কাজগুলোকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ এবং সেইসঙ্গে বইগুলোকে ল্যাটিন ভাষায় নামকরণও করেছিল। পরবর্তী কয়েক বছর ইউরোপিয়ানরা সেই সব মুসলিম বিজ্ঞানী এবং তাঁদের মৌলিক কাজগুলোর কথা অনেকটা ভুলেই গিয়েছিল।

অথচ, মুসলিম বিজ্ঞানীদের সেই সব রেখে যাওয়া কাজের ওপর ভিত্তি করে তৎকালীন সময়ের ইউরোপ বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিহাসকে সচেতনভাবে আড়াল করার অপচেষ্টার পাশাপাশি মুসলিমবিরোধী একটি চেতনাকেও সর্বত্র জাগিয়ে তোলা হয়। ফলে মুসলিম বিজ্ঞানী এবং তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজগুলো আর পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বীকৃতি পায়নি।

যদিও মুসলিম চিন্তাবিদদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিজ্ঞান সমৃদ্ধ জ্ঞানের চর্চা উপরিউক্ত কারণগুলোর প্রেক্ষাপটে অনেকটাই থেমে গিয়েছিল, তবে মুসলিম বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন, তার একটি ধারাবাহিক অগ্রগতি পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীদের সকল সৃষ্টি ও অনবদ্য কর্মগুলো আরবি ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফলে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং দর্শনের মতো বিজ্ঞানের নানা শাখা সম্বন্ধে জানার সুযোগ পায়। ইউরোপের অনেক ছাত্র-ছাত্রীরাই কর্ডোভা, টলেডো, বাগদাদ ও দামেস্কে এসে বিভিন্ন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করে। ছাত্রজীবন শেষে তারা ইউরোপে ফিরে গিয়ে নিজেদের দেশে একই ধারায় প্রতিষ্ঠা করে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউরোপিয়ান অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই গোড়ার দিকে আরবি ও ল্যাটিন ভাষাই ছিল পাঠদানের মূল মাধ্যম। ইউরোপে নতুন নতুন যেসব মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানেও মুসলিম স্পেন এবং বাগদাদে রচিত পাঠ্যবই পড়ানো হতো। এই সব পাঠ্যবইয়ের সিংহভাগই মুসলিম চিকিৎসাবিদগণ লিখে গিয়েছিলেন—যা আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এই সমস্ত বই-পুস্তকই ষোলো শতক পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের মূল উৎস হিসেবে বিরাজমান ছিল।

মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির হার কমে যাওয়ার একটি বড়ো কারণ—মুসলমানরা ক্রমশ বিজ্ঞানের ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিল। মুসলিম দেশগুলোতে উৎপত্তি ঘটেছিল দুটো সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার। একটি হলো শরয়ি—যেখানে ইসলামি আইন ও বিচার-দর্শন পড়ানো হতো। আরেকটি উলুম আল আকলিয়া—যেখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। কালক্রমে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল, মুসলিম অঞ্চলগুলোতে বিবর্তনবাদকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হলো। মুসলমানরা ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল আধুনিক বিজ্ঞান থেকে।

বিজ্ঞানবিষয়ক অনাগ্রহের পরিণতিতে মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপারেও উদাসীনতা তৈরি হয়। মাদরাসাগুলোতে গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। তার পরিবর্তে এই সব প্রতিষ্ঠানে ধর্মতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক এবং ইসলামের ব্যবহারিক ও আচরণগত নানা বিষয়ে পাঠদান শুরু হয়। এককথায়, মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপারে সৃষ্টি হয় একধরনের অনাগ্রহ। তৎকালীন সময়ের মুসলমানদের ধর্মীয় উন্মাদনা, সংকীর্ণ মানসিকতা এবং সহনশীলতার অভাব প্রসঙ্গে মঞ্জুর আলম বলেন—

> 'ইসলামি সাম্রাজ্য হতে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব কমতে শুরু করে। ফলে ইসলামের অনুসরণকারীদের মধ্যে একধরনের উগ্রবাদীদের উত্থান হয়—যারা মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চার পথকে আটকে দিতে সক্ষম হয়। ১৫৪৫ সালে মুসলিম খলিফা তাকিউদ্দিন ইস্তাম্বুলে জ্যোতির্বিদ্যার একটি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। ১৫৮০ সালে ধর্মান্ধ মুসলমানদের একটি অংশ সেই মানমন্দিরটিকে ধ্বংস করে।
>
> অন্যদিকে, সুফিজম ও ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটায় ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যেও বিজ্ঞানচর্চা সংকুচিত হয়। একই ধরনের বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা দেখা যায় তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যে, আরবে এবং মাগরিবের অন্যান্য ছোটো ছোটো ইসলামি রাজ্যেও। ১৬ শতকের পর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্প্যানিশ, জার্মান, ইতালিয়ান, ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত হওয়ায় ভাষার ভিন্নতাও মুসলমানদের জন্য বড়ো আকারের সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভাষা বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে এবং মুসলিম দেশগুলো দ্রুততার সঙ্গে পশ্চাৎপদতার দিকে ধাবিত হয়।'[৪১]

মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীরা যদি তাঁদের গবেষণা ও বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখতে পারতেন, তাহলে পৃথিবীর আজকে কী চিত্র হতো—তা আমরা হয়তো কল্পনাও করতে পারব না।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে মুসলমানদের তেমন একটা অংশগ্রহণ নেই। বিশ্বে বিজ্ঞানীদের মোট সংখ্যার এক শতাংশও মুসলমান নয়; অথচ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগ মুসলমান। আমাদের মুসলমানদের কারও কারও মধ্যে এ রকম ধারণা আছে—আল কুরআনেই সব ধরনের জ্ঞান বিদ্যমান। আবার এমন কিছু রক্ষণশীল মানসিকতার মুসলমানও রয়েছে, যারা বিজ্ঞানচর্চাকে পশ্চিমা ধারার জ্ঞান হিসেবে অভিহিত এবং মুসলমানদের বিজ্ঞান গবেষণায় নিরুৎসাহিত করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে একজন বিজ্ঞানী হতে গেলে মানুষকে অবশ্যই নির্মোহ ও অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা নিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখতে হবে। একজন বিজ্ঞানীর কাজ মূলত তার স্বাধীন চিন্তার ওপর নির্ভরশীল। কেননা, চিন্তা থেকেই আসবে অনুমান, পর্যালোচনা, নিরীক্ষা এবং সবশেষে মূল্যবান কিছু পর্যবেক্ষণ।

এই ধরনের বাস্তবতা মুসলিম সমাজে না থাকার কারণেই কালক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (মূল হিকমাহ) সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাচ্য থেকে পশ্চিমের হাতে ছুটে যায়। বিজ্ঞান কখনোই কোনো একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের হাতে বন্দি থাকতে পারে না। বিজ্ঞান মানে একটি চলমান বিবর্তনমূলক ধারা—যেখানে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ের লোকজন সময়ের পরিক্রমায় অবদান রেখে যাবেন।

৪০০ বছরের দীর্ঘ স্থবিরতার পর বর্তমান সময়ের মুসলমানরা আবার যেন জেগে উঠছে এবং আগ্রহী হয়ে উঠছে তার হারানো পরিচিতি ও সুনাম পুনরুদ্ধার করতে। আমরা মুসলমানরা এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া অবদানগুলোকে নতুন করে জানার চেষ্টা করছি। আমরা আবার মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড নিয়ে গর্বিত হতে শিখছি। আমরা অনুধাবন করতে পারছি, আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতা এতদিন আমাদের নানা ধরনের ভুলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে, মুসলমান সম্প্রদায়ের রেখে যাওয়া অবদানগুলোকে দিব্যি অস্বীকার করে যেভাবে বিজ্ঞানকে একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার জিম্মায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা ইতিহাসের মস্ত বড়ো একটা বিকৃতি। সেই বিকৃত ভুলগুলোকে সংশোধন করতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সম্পর্কে আমরা ক্রমাগত সচেতন হয়ে উঠছি, আলহামদুলিল্লাহ!

আশা করা যায়, বর্তমান প্রজন্মের মুসলিম যুবকরা আবারও নিজেদের মুসলমান হিসেবে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে বিশ্বসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখতে পারবে। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলেই বিজ্ঞানকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। এখানে অবদান আছে মুসলিম ও অমুসলিম সবারই। মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং একটি প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে—বিশেষ করে গ্রিকদের কাছ থেকে মুসলমানদের এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের কাছ থেকে পশ্চিমে অবাধ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সভ্যতা আজ এই পর্যায়ে এসেছে। বর্তমান সময়ে এসে আবার প্রাচ্য ও পশ্চিম—উভয় জগৎ থেকেই উত্থান ঘটছে সম্ভাবনাময় এবং প্রতিশ্রুতিশীল যুবকদের। যদিও এই প্রবন্ধে মুসলমান দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের খুব সামান্য অংশই তুলে ধরা সম্ভব হলো, তারপরও এর মাধ্যমে আমরা আমাদের কীর্তিমান পূর্বপুরুষদের কার্যক্রম সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়ে যাব। যদি এই প্রবন্ধ পাঠকদের মনে প্রকৃত ইতিহাস ও সভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের ভূমিকা সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে আগ্রহী করে তোলে, তাহলে এই পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সামনে এনেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে না। আমাদেরক আমাদের যুব প্রজন্মদের অর্থাৎ মুসলিম যুবকদের গবেষক এবং চিন্তাশীল হওয়ার পথে উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। তারা যেন এমন কিছু কাজ করে যেতে পারে, যার ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষরাই ভবিষ্যতে উপকৃত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Quran*- Translation and Commentary (Brentwood, MD Amana Corp., 1989), p. 1472
2. P. Lande, *Science in al-Andalus, in Science: The Islamic* Legacy (Washington, DC: Aramco, 1988)
3. S.H.H. Nadvi, *Medical Philosophy in Islam and the Contributions of Muslims in the Advancement of Medical Sciences* (Durban, South Africa: Academia Centre for Islamic, Near and Middle Eastern Studies, 1983)
4. M.A. Khan, *Origin and Development of Experimental Science* (Dhaka: BIIT, 1997)
5. M.R. Mirza & M.I. Siddiqi (eds.), *Muslim Contributions to Science* (Lahore, Pakistan: Kazi Publications, 1986)
6. M. Saud, *Islam and Evolution of Science* (Delhi: Adam Publishers, 1994)
7. T.J. Abercrombie, 'When the Moors Ruled Spain,' National Geographic (July, 1988)
8. C.J.M Whitty, The Impact of Islamic Medicine on Post-Medieval England (Hyderabad, India: Islamic Culture, 1999)
9. H.J. Morowitz, *History's Black Hole, Hospital Practice* (1992), pp.25-31
10. E.G. Brown, *Arabian Medicine* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1962); M. Ullman, *Islamic Medicine* (Karachi, Pakistan: Edinburg Press, 1978). E. Savage-Smith, *Islamic Culture and Medical Arts* (Bethesda, Md: National Library of Medicine, 1994); G. Sarton, *Introduction to History of Science*, Vol.I, (Washington, DC: Carnegie Institute; Baltimore, Md: William & Willkins, 1927; reprinted 1950); E.A. *Myres, Arabic Thought and the Western World in the Golden Age of Islam* (New York: Funga Publications, 1964), pp. 7010, 66-77;P.K Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan, 1964)
11. Bernard Lewis, *The Middle East* (New York: Scribner Publications, 1998)

12. S.H. Nasr, *Islamic Science: An Illustrated Study* (London: World of Islamic Festival Publishing, 1976)
13. Abercrombie, 'When the Moors Ruled Spain.'
14. J. Esposito, *Islam: The Straight Path* (Oxford, UK: Oxford University Press, 1998)
15. Nadvi, *Medical Philosophy in Islam.*
16. Robert Briffault, *The Making of Humanity* (1938).
17. Whitty, *The Impact of Islamic Medicine*
18. Briffault, *The Making of Humanity*
19. H.N. Wasti, *Muslim Contributions to Medicine* (Lahore, Pakistan: 1962)
20. H.N.Wasti, *Hospitals are owned by Arab Physicians in the Middle Ages, in Muslim Contributions to Science,* ed. M.R. Mirza & M.I. Siddiqi (Pakistan: Kazi Publications, 1986)
21. Whitty, *The Impact of Islamic Medicine*
22. Wasti, *Muslim Contributions to Medicine*
23. *Encyclopedia Britannica*, Vol. I, Micropedia (1983), p-37
24. *Muslim Contributions to Chemistry* (FSTC, 2003)
25. Khan, *Experimental Sciences*
26. David Tschnaz, *Jabir Ibn Hayyan and Rab AlChemists: Makers of Modern Chemistry*
27. A. Zahur, *Muslim History* 570-1950 (Gaithersburg, MD: ZMD Corp,. 2000)
28. Lande, 'Science in al-Andalus, A.Z. Ashoor, 'Muslim Medieval Scholars and their works,' The Islamic World Medical Journal (1984)
29. M. Levey, *Early Arabic Pharmacology* (Leiden, The *Netherlands* E.J. Brill, 1973), pp. 68-70
30. Saud. *Islam and Evolution of Science*
31. G. Sarton, *Introduction to History of Science*, vol. 2 (Washington, DC: Carnegie Institute; Baltimore, MD: William & Willkins, 1931; reprinted 1950)

32. H. Sayeed, *Muslim Scholars* (Pakistan: National Science Council, Internet Edition 2000)
33. *Encyclopedia Britannica*, Vol. 9, Micropedia (1983), p: 198-199
34. S.A. Ahsani, *Al Mawardi's Political Paradigm: Principles of Islamic Political Syste* (n.d.)
35. *Encyclopedia Britannica*, Vol. III, Micropedia (1983), p-147-149
36. Sayeed, *Muslim Scholars*
37. Salam, *Islam and Science*
38. Herbert H. Rowen, *A History of Early Modern Europe 1500-1815* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1960)
39. Al-Hassan, Ahmady and Hill, Donald, *Islamic Technology-An Illustrated History* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1988)
40. P.k Hitti, *History of the Arabs*
41. *Manzoor S. Alam, A critical Appreciation of Arab Human Development Report* (Unpublished work, 2002)

আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে ইসলামি অর্থনীতির উপযোগিতা—মুহাম্মাদ শরিফ

ভূমিকা

এই বইটির মূল প্রতিবাদ্য বিষয়—বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদানকে তুলে ধরা। বিশ্বজুড়ে অগ্রসরমান অর্থনীতির নেপথ্যে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ অবদানগুলোকেই এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। যেকোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধনের জন্য অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অপরিহার্য। এই আলোচনাটি স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা বিস্তৃত হওয়ার কথা থাকলেও সময় ও পারিপার্শ্বিক স্বল্পতার কারণে প্রধানত একটি বিষয়ের ওপরই নজর দেওয়ার চেষ্টা করব—অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং মানব উন্নয়ন। আশা করি, সংক্ষিপ্ত আলোচনা মধ্য দিয়ে হলেও পাঠকেরা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো অনুধাবন এবং ইসলামি অর্থনৈতিকব্যবস্থার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে আমি ইসলামি ব্যবস্থাপনার কিছু মৌলিক নীতিমালা নিয়ে কথা বলতে চাই। ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর ইসলামের অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলো সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থারই একটি অংশ মাত্র। ফলে এই আলোচনাটিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করতে চাই। প্রথম অংশে—পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাসমূহকে নিয়ে আলোচনা।

বিশেষ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক খাতে ইসলাম যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছে, তার সঙ্গে সমসাময়িক মতবাদগুলোর অবস্থানের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে।

দ্বিতীয়ত—আমি অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মধ্যকার পার্থক্য এবং ন্যায়বিচার ও মানব উন্নয়নে এগুলোর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা। এক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনৈতিকব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে নির্ণয় এবং এগুলোর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো নিয়েও মূল্যায়ন করা হবে।

তৃতীয়ত—আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা এবং সেখানে বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোর ভারসাম্যহীনতা নিয়ে আলোচনা। সবশেষে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালাগুলোকে অনুসরণ করে কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান এই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, সেই প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা করা হবে।

ইসলামি পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালা

যেকোনো একটি পদ্ধতিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার পূর্বশর্ত—সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই পূর্বশর্তগুলো পূরণের দুটো উপায় আছে—হয় বল প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত, নাহয় মন জয় করে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের উদ্যোগ।

জোরপূর্বক অংশগ্রহণ করানোর কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে : ক. জটিল আইনি কাঠামো প্রণয়ন, খ. কঠোর হাতে সেই আইনগুলো প্রয়োগ এবং গ. কেউ আইন মানতে সম্মত না হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে পৃথিবীতে এই পদ্ধতির আওতায়ই পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ কাজ করে যাচ্ছে। এর বিপরীতে, ইসলামিক পদ্ধতি এমন কিছু বিকল্প পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে, যার ফলে সমাজের সদস্যরা স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়েই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে এগিয়ে আসে।

এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয় মূলত জীবনকে দেখার দর্শনগত ভিন্নতার কারণে। সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ—এই দুটো পদ্ধতি মানুষের জীবনকে শুধু শরীর ও মনের সম্মিলন হিসেবেই বিবেচনা করে। এই দুটি মতবাদ তাদের জীবন দর্শন প্রক্রিয়া থেকে আত্মাকে বিলুপ্ত করে এবং মানুষকে তার স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে উৎসাহ দেয়। যেহেতু এই সব দর্শন অনুযায়ী, সমাজ পরিচালনায় আত্মার কোনো মূল্য নেই, তাই এর অনুসারীরা অর্থনীতি,

রাজনীতি কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই মানুষের আত্মাকে গুরুত্ব দিতে চায় না। ফলে এই ধরনের সমাজে মানুষ শুধু বৈষয়িক সম্পদ, ক্ষমতা আরাম-আয়েশ উপভোগ করা নিয়েই ব্যস্ত থাকে; আত্মার খোরাক মেটানোর কোনো তাগিদ তারা অনুভব করে না। যেহেতু এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় বস্তুবাদি মানসিকতার বাহিরে আর কোনো শক্তিশালী চিন্তাধারার অস্তিত্ব থাকে না, তাই ডারউইনের টিকে থাকার তত্ত্বটি—সমাজে শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে/ সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট—সমাজের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। মানুষজনও পার্থিব লোভ-লালসা ও দুনিয়াবি চাহিদা পূরণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় দুর্বলের ওপর সবলেরা চড়াও হয় এবং উদ্ভব হয় নানা ধরনের অনাচার, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অস্থিতিশীলতার। ফলে বেপরোয়া এসব মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এ ধরনের বস্তুবাদী সমাজগুলোতে কঠোর আইন প্রণয়ন ছাড়া উন্নয়ন নিশ্চিত করার আর কোনো পথ খোলা থাকে না।

আত্মার উন্নয়নের জন্য চাই নৈতিকতা ও ব্যবহারিক আচরণসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট কোনো বিধান। কিন্তু বস্তুবাদী সমাজে এ ধরনের নৈতিক চর্চার অবকাশ না থাকায় মানুষকে শুধু আইনের ভয় দেখিয়েই দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কারণ, কঠোর আইন প্রয়োগ করা না হলে এই ধরনের বস্তুবাদী কাঠামোর আওতায় আইন লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো বিষয়গুলো মোটামুটি স্বাভাবিক চর্চায় পরিণত হয়।

যদিও এই ধরনের সমাজে অনেক সময় উল্লেখযোগ্য বস্তুগত উন্নয়ন ঘটে, তারপরও সমাজ কাঠামোগুলো থাকে অনেক বেশি সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকেই মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণভার নিজের হাতে নিয়ে নেয়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি জমা হয়। এই দুই ত্রুটিপূর্ণ মতবাদের ব্যবস্থাপনার ভেতর নানা ধরনের সংকট ও বৈষম্য থাকায় সমাজকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়। যেমন : সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। আবার পুঁজিবাদী সমাজে প্রকট দরিদ্রতার সৃষ্টি হয় এবং সার্বিকভাবে এই দুটি ব্যবস্থাতেই দেখা দেয় মারাত্মক আকারে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। এ ধরনের ব্যবস্থাপনার আওতায় সকলেই দুনিয়াবি লালসায় ব্যস্ত থাকে। তাই সমাজজুড়ে শুরু হয় স্বার্থের সংঘাত। বিদ্যমান ভারসাম্যহীনতা এবং দরিদ্রতাকে কেন্দ্র করে তীব্র বঞ্চনার সূচনা হয়। এর বাইরেও প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন আরও নানা সমস্যার সূত্রপাত হয়, যা মোকাবিলা করতে গিয়ে রীতিমতো নীতি-নির্ধারকদের নাভিশ্বাস ওঠে।

সমাজকে স্থিতিশীল ও সংযত রাখার স্বার্থে নিত্য নতুন আইন প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে। ফলে, সমাজের সার্বিক কাঠামো আরও বেশি জটিল হতে শুরু করে। আর জটিল আইনি কাঠামো না মানা হলে প্রতিকারমূলক শাস্তিটাও হতে থাকে তীব্র থেকে তীব্রতর।

কীভাবে কঠোর ও রক্ষণশীল আইনি ব্যবস্থা প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়—তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে নির্বিচারে বন্দিকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে একটি তথ্য থেকে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭০ লাখ লোক কারাগারে রয়েছে, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ। শাস্তি দেওয়ার এই কৌশলটি প্রয়োগ করে অপরাধের মাত্রা যে খুব কমানো গেছে—তা কিন্তু নয়। তবে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ন্যূনতম মান বজায় রেখে পরিচালিত হচ্ছে—এমনটা বলা যায়। তারপরও বাস্তবতা হলো, এই ৭০ লাখ মানুষকে জেলে রাখতে প্রতিবছর দেশটির সরকারকে ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গুনতে হয়। প্রতি একজন কারাবন্দির জন্য বছরে ব্যয় করা হয় ৩৫ হাজার ডলার। মনে রাখতে হবে, অপরাধভিত্তিক বিচার পদ্ধতি অনেক বেশি ব্যয়বহুল। আর এই কারাগার খরচ হলো সেই বিপুল পরিমাণ খরচের খুব সামান্য একটি অংশ।

এর বিপরীতে ইসলাম সব সময়ই সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সুরক্ষা করার কথা বলে। সেইসঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার তাগিদ দেয়। ইসলাম বলছে, এই ধরনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আইনের হুমকি-ধমকি দিয়ে অর্জন করা যাবে না; বরং সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে উন্নত করেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম পশ্চিমা চিন্তাধারা বা মতবাদের মতো করে মানুষের জীবনকে মূল্যায়ন করে না; বরং ইসলাম মানুষের জীবনকে শরীর, মন ও আত্মার সম্মিলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ইসলামে জীবনের তিনটি বিষয়কেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত মানের উন্নত মানুষ হওয়ার জন্য প্রতিটি মানুষকে নিরলস অনুসরণ করে যাওয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম মনে করে, উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ যত বেশি হবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোও তত বেশি সফলতার সাথে পরিচালনা করা যাবে।

আর তাই আত্মার খোরাক পূরণ না করে কখনোই একজন মানুষ তার জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবে না।

মানুষের দেহ কয়েক টুকরো মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। আর মানুষের মনকে তার মস্তিষ্কই পরিচালনা করে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক দুটোই নশ্বর। অন্যদিকে, মানুষের আত্মা কখনোই মরে না। একজন ব্যক্তি মারা গেলে তার আত্মা দেহ ত্যাগ করে আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, শরীর ও মন কেবল মানুষের জৈবিক ও পার্থিব চাহিদা পূরণে ব্যস্ত। এর বিপরীতে, আত্মা মানুষের মধ্যে চেতনা দান করে। ফলে ব্যক্তির সামনে আধ্যাত্মিক একটি জগতের দরজা খুলে যায়। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই একজন মানুষের জীবন হয় পরিপূর্ণ। আর এই কারণে, মানুষের প্রত্যাশিত সফলতা অর্জনের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অপরিহার্য।

ইসলামিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্থিতিশীলতা অর্জন; সর্বোপরি অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া ইসলামি সভ্যতার ভিত্তিও এভাবেই রচিত হয়। ইসলাম প্রত্যাশা করে, ইসলামের অনুসারীরা এই দুনিয়াবি জীবনকে ক্ষণস্থায়ী বলেই বিবেচনা করবে। সেইসঙ্গে তারা এ-ও জানবে, মৃত্যুর পরই প্রকৃত জীবন শুরু—যার কোনো সমাপ্তি নেই। পরকালে মানুষের জীবন কেমন হবে, তা নির্ভর করে এই পৃথিবীতে মানুষ কী করছে, তার ওপর। শেষ বিচারের দিন মানুষকে তার নেক আমলের জন্য আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার প্রদান করবেন; একইভাবে দুনিয়ায় করা অসদাচরণের জন্য শাস্তিও দেওয়া হবে। প্রতিটি মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। মানুষ যা করছে, ভাবছে, বলছে—তার প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আল্লাহ সংরক্ষণ করেন এবং সেই রেকর্ড বা আমলনামা আমাদের সামনে শেষ বিচারের দিন হাজির করা হবে।

ইসলামের অপরিহার্য চেতনা এতটাই শক্তিশালী, এই চেতনা সমাজের সদস্যদের ওপর সব রকমের আইনি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস করে দেয়। ফলে মানুষের সামনে আত্মপর্যালোচনার পথ উন্মুক্ত থাকে। এতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে পারে। এভাবে মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পক্ষে সুযোগ তৈরি হয় নিজের ওপর নজর রাখার। ফলে ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবহারিক বিধিও প্রণয়ন করা সম্ভব হয়।

সেইসঙ্গে ইসলামিক আচারাদি অনুশীলনের কারণে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন ঘটে। ফলে সার্বিকভাবে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি পার্থিব উন্নয়নও হয় এবং এভাবেই সভ্যতা এগিয়ে যায়।

ইসলামিক প্রক্রিয়ার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা আছে। প্রথমত, আত্মপর্যালোচনা এবং নিজস্ব তত্ত্বাবধানের সুযোগ থাকায় জটিল ও দুর্বোধ্য আইনি প্রক্রিয়া প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে একেবারেই থাকে না অথবা অনেকটুকুই কমে যায়। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে উৎসাহ পায়। প্রথম উপকারিতার ফলাফল হিসেবে সামাজিক সম্পদগুলো; বিশেষ করে মানুষ ও বস্তুগত অন্যান্য সম্পদগুলোকে উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। আর দ্বিতীয় উপকারিতার ফলে এককভাবে প্রতিটি ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পাদিত হয়। সমসাময়িক নানা মতবাদে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা, বঞ্চনা ও দরিদ্রতার সুযোগে সমাজেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তার অনেকটুকুই ইসলামি পদ্ধতিতে বিলীন হয়ে যায়। সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ অলসভাবে পড়ে থাকতে হয় বা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে হয়, ইসলামিক পদ্ধতিতে তার অবকাশ থাকে না। একই সঙ্গে, মানুষের আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটায় ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ হয় না; বরং সম্পদকে পুরোপুরিভাবে মানুষের উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গ

বেশ লম্বা একটা সময় ধরে অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন—এ দুটো বিষয়কে মোটামুটি একই হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ষাটের দশকের শেষ দিকে এসে সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদরা এ দুটি বিষয়কে পৃথক করতে সক্ষম হন।[১] আশির দশকে আবারও তারা পূর্বচিন্তায় ফিরে আসতে থাকেন। বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়নের সঠিক কৌশল নির্ধারণের গুরুত্ব নিশ্চিত করতে গিয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপর জাতিসংঘের আওতাধীন ইউএনডিপি'র উদ্যোগে প্রবর্তন হয় মানব-উন্নয়ন সূচক পদ্ধতির।[২] যেখানে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপায়ে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশের অগ্রগতিকে পরিমাপ করা চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে, ইসলাম বরাবরই মানুষের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করেই সপ্তম শতকে মুসলমানরা অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছিলেন।

আলোচনার এই পর্যায়ে উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি—এই দুটো বিষয়কে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে মাথাপিছু আয় এবং সেইসঙ্গে প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামো উন্নয়নকে বোঝানো হয়। নির্মাণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ওপর দেওয়া হয় বাড়তি গুরুত্ব। অপরদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হলো—ব্যক্তিবিশেষের মেধা ও যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজে লাগানো। অর্থনৈতিক অগ্রগতি তথা উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের সামনে এমন কিছু পথ উন্মুক্ত হয়—যাতে তারা নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এককথায় বলতে গেলে—উন্নয়নের মধ্যেই প্রবৃদ্ধি নিহিত এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিপর্যায়ের অবদানকেও উন্নয়নের মধ্যে সংযুক্ত করা হয়।

অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি মানে হলো, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক সম্পদের বিকাশ; তা যেভাবেই হোক না কেন। অর্থাৎ যে কেউ যেকোনোভাবে সম্পদশালী হতে পারবে এবং তাতে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না। অন্যদিকে উন্নয়ন বলতে সার্বিকভাবে জনগণের সম্পদের বিকাশকে বোঝায়—যেখানে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিগুণ, স্বাস্থ্যসেবা, গড় আয়ু, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দেওয়া হয় রাষ্ট্রের জিম্মায়, আর পুঁজিবাদি কাঠামোতে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মহলের হাতেই অধিকাংশ সম্পদকে ছেড়ে দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হওয়ার দাবি করা হয়। পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিশ্চিত করা যায়। তবে এর জন্য বিপুলসংখ্যক মানুষকে গুনতে হয় চড়া মাশুলও। বিশেষ করে—দরিদ্রতা, ক্ষুধা ও অপুষ্টি, আবাসন সংকট, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষার অভাবকে পুঁজিবাদী সমাজে প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি, পুঁজিবাদী কাঠামোতে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল মাত্রায় থাকায় সমাজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়। ফলে অসংখ্য মানুষকে বল প্রয়োগ করে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়; যার পরিণতিতে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনের হার হ্রাস পায়। কেননা, সেখানে সাধারণ শ্রমিক ও চাকরিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিদ্যমান থাকে। সেইসঙ্গে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কার্যকর রাখতেও বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে ধীরে ধীরে এই পদ্ধতিটি অকার্যকর হতে শুরু করে। ফলে সভ্যতার বিকাশে সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে অবদানগুলো রাখতে পেরেছিল, তা বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিও সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে বিভক্ত হয়ে গেল, তার মাধ্যমেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অন্তর্নিহিত অস্থিতিশীলতা প্রমাণিত হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নসংক্রান্ত ইসলামি নীতিমালার আওতায় ব্যক্তি বিশেষের উন্নয়নের পাশাপাশি নিশ্চিত করা হয় সামাজিক সম্পদের বিকাশকেও। এর মাধ্যমে প্রমাণিত, সমাজের প্রতিটি সদস্যই সম্পদ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম এবং তাদের অবদানের ওপর ভিত্তি করে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। ফলে, ইসলামি অর্থনৈতিক নীতিমালা বরাবরই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। এই পদ্ধতির অনুসরণ করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন টেকসই হয়। তাই সভ্যতা বিনির্মাণে, ইসলামি অর্থনীতি যে অবদান রাখে, তা অন্য যেকোনো সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরভাবেই টিকে থাকে।

ইসলামিক নীতিমালায় ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হওয়ায় এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মানসিকভাবে সন্তুষ্ট থাকে। সেইসঙ্গে উন্নয়নের ভিত্তি মূল ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার কারণে সভ্যতার অগ্রগতিতে স্থিতিশীল অবদান রাখাও সম্ভব হয়। ফলে বহিঃশক্রর আক্রমণ না হলে সচরাচর এই অবদানগুলো বিনষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগও নেই। এ কারণেই দেখা যায়, ক্রুসেডার কিংবা মোঙ্গলীয়দের আক্রমণের ফলেই সভ্যতার উন্নয়নে মুসলমানদের অবদানগুলো বিনষ্ট হয়—অন্য কোনো কারণে নয়।

ইসলামের অর্থনৈতিকব্যবস্থা

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন, তা উপলব্ধি করার কতগুলো মানদণ্ড আছে। যেমন—

১. উক্ত অর্থনৈতিকব্যবস্থার আওতায় সম্পদের মালিকানা এবং ব্যবহার কীভাবে নির্ধারিত হয়

২. দ্বিতীয়ত, আদান-প্রদান কীভাবে হয়

৩. তৃতীয়ত, সম্পদ কীভাবে বরাদ্দ করা হয়

৪. আয় ও সম্পদ কীভাবে বণ্টন করা হয় এবং

৫. সর্বশেষ পরিণতিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় সমাজ কী ভূমিকা পালন করে তা-ও বিবেচনা নিতে হয়।

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে যে ভিন্নতাগুলো রয়েছে, তা ইতোমধ্যেই অনেকটা পরিষ্কার। যেহেতু বর্তমান বিশ্বে অনেকের কাছেই ইসলামি অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নেই, তাই তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করতে ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামি অর্থনীতির অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে—যা আংশিকভাবে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সাথেও সংগতিপূর্ণ।

একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সম্পদের মালিকানা নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকেই তাই অন্য সবকিছুর আগে নির্ধারণ করা উচিত। ইসলামে প্রদত্ত বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্বের যাবতীয় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিসহ বিদ্যমান সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক। এ পৃথিবীতে আল্লাহর মনোনীত খলিফা হিসেবে মানুষকে অন্য সকল সম্পদের জিম্মাদার হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। মানুষ নিজেদের কল্যাণের স্বার্থে পার্থিব সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। তবে সম্পদ ব্যবহারের এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে হতে হবে অনেক বেশি দায়িত্ববান। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মিল নেই। ইসলাম মানুষকে দুনিয়াবি সম্পদের মালিকানা দেয় না; কেবল ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করার অধিকার দেয়।

এই কারণে—ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলতে গেলে—মানুষ সম্পদের মালিক না হয়েও মালিকের মতো করেই সম্পদ কাজে লাগাতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মালিকের সঙ্গে ব্যবহারকারীর পার্থক্য হলো—একজন ব্যবহারকারীকে অনেক বেশি সীমাবদ্ধতা এবং মালিক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই চলতে হয়। ইসলাম বলছে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পার্থিব সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন এবং একই সঙ্গে ব্যবহারকারী হিসেবেও মানুষের কিছু করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এভাবে ইসলাম একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ করার ক্ষেত্রে মানুষকে সংযম ধারণ করবার তাগিদ দেয়, আবার অন্য কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানা, আধিপত্য বা স্বৈরাচারী আচরণের হাত থেকেও গোটা সমাজকে রক্ষা করে। ইসলামিক বিধিবিধানে সম্পদ ব্যবহার করার যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, পুঁজিবাদেও সেই সুযোগটি দেওয়া হয়। তবে সমাজতন্ত্র যেভাবে একটি কর্তৃপক্ষের হাতে যাবতীয় কর্তৃত্ব ও মালিকানা প্রদান করে,

ইসলামে তেমনটা বলা হয় না। ইসলামে বরং বলা হয়েছে—সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, সমাজের প্রতিটি সদস্য তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে এবং সম্পদ ব্যবহারে তাদের ওপর যে বিধিনিষেধগুলো ছিল বা আছে, সেগুলোও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইসলামের এই অনুপম দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ পেলেও নিজ দায়িত্ববোধ ও জিম্মাদারি থেকে সে কোনোভাবেই বাঁচতে পারে না। অন্যদিকে, সামাজিক কর্তৃপক্ষগুলোকেও প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধিনিষেধগুলোকে প্রয়োগ করতে ইসলাম বারবার তাগিদ দিয়ে যায়। এককথায়, ইসলামের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে একদিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়, অন্যদিকে সামাজিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনেরও সুযোগ থাকে। এই কারণে, অনেকেই ইসলামকে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলন হিসেবে আখ্যায়িত করে।

ব্যক্তিকে সম্পদের অধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামি অর্থনৈতিক—ব্যবস্থা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ইসলামি অর্থনীতির মূল নিয়ামক হলো—ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগ। এ কারণে ইসলাম সব সময় নিত্য-নতুন ও সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন—

> 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্যই জমিনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আকাশের প্রতি মনোসংযোগ করেছেন। বস্তু তিনি তৈরি করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।' সূরা বাকারা : ২৯

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

> 'অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো—যাতে তোমরা সফলকাম হও।' সূরা জুমআ : ১০

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার করা হয়েছে, পৃথিবী মূলত মানুষের জন্যই, যাতে মানুষ পৃথিবীতে বিদ্যমান সবকিছুকে অনুসন্ধান এবং কাজে লাগানোর চেষ্টা করে।

আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

'তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে—সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন?' সূরা লোকমান : ২০

প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে মুসলিম জীবনে সচ্ছলতা উপভোগ করার অবকাশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত মানুষ কতটা আয় করতে পারবে কিংবা তার আলোকে কতটা ব্যয় করতে পারবে—ইসলাম তাতে কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে ব্যক্তিগত আয় ও ব্যয়ের ওপর ইসলাম বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে। কীভাবে টাকা আয় করা যাবে বা কোন কোন খাতে টাকা ব্যয় করা যাবে, সেই ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে পরিষ্কার নির্দেশনা। আল কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন—

'আল্লাহ তায়ালা ব্যাবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। সূরা বাকারা : ২৭৫

সুদ হলো ঋণের ওপর পূর্বনির্ধারিত কিছু বাড়তি অর্থ, যা ঋণ গ্রহীতাকে ফেরত দেওয়ার সময় প্রদান করতে হয়। ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহীতা লাভ করুক কিংবা লোকসান করুক—তাকে এই সুদ দিতেই হবে। ইসলাম সুদ নেওয়া ও দেওয়াকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামের এই বিধানগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়—যদিও ইসলাম আয়-রোজগার বৃদ্ধির এবং সম্পদ তৈরির সুযোগ দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে ইসলামে অবৈধভাবে সম্পদ তৈরি এবং অন্যের সম্পদ কুক্ষিগত করার সকল পথও বন্ধ করে দিয়েছে। পণ্যের দাম বাড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মজুদ করে রাখা কিংবা ব্যাবসার নামে হুটহাট কালোবাজারি বা জুয়া খেলাকেও নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম ।

ইসলাম সমাজের প্রতিটি সদস্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার তাগিদ দেয় এবং অন্যের ওপর অযাচিতভাবে নির্ভরশীল থাকতে নিরুৎসাহিত করে। রাসূল ﷺ-এর জীবনে এমন বেশ কিছু ঘটনা আছে—যা ইসলামের এই চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আমরা এ রকম দুটি ঘটনাকে এখানে উল্লেখ করছি—

একদিন একজন ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইতে এলো। রাসূল ﷺ তাকে সরাসরি সাহায্য করার পরিবর্তে সে ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন,

তার ঘরে পরিত্যক্ত বা অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস আছে কি না। লোকটি জানাল, তার ঘরে কিছু পরিত্যক্ত গৃহস্থালি সামগ্রী রয়েছে। নবিজি লোকটিকে পরিত্যক্ত সেই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে বললেন। লোকটি ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসার পর নবিজি সাহাবিদের কাছে নিলামে বিক্রি করলেন। সেখান থেকে যে অর্থ এলো, তার কিছু অংশ তিনি লোকটিকে দিয়ে তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য খাবার কিনতে বললেন। আর অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে একটি কুঠার কিনতে বললেন—যা দিয়ে লোকটি বনে গিয়ে গাছ কেটে, সেই কাঠগুলো বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

আরেকটি ঘটনা এ রকম। একদিন নবিজি দেখলেন, একজন ব্যক্তি সারাদিন মসজিদে বসে থাকে। শুধু প্রাকৃতিক কাজ করার জন্য সে মসজিদ থেকে বাইরে যায়, এর বাইরে অন্য কোথাও যায় না। আর দিনে তিনবেলাই অপর একজন ব্যক্তি তার জন্য খাবার নিয়ে আসে। এই দৃশ্য দেখে রাসূল ﷺ মসজিদে বসবাসরত ওই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং তার কাছে জানতে চাইলেন, কেন তিনি সর্বক্ষণ মসজিদে অবস্থান করছেন। সে ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে জানাল, তার নিজের পরিবার ও সন্তানাদি আছে। তারপরও তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করছেন। আর যে ব্যক্তি তাকে খাবার দিয়ে যাচ্ছে, তিনি মূলত তারই ভাই। তারও পরিবার আছে। তবে তিনি ইবাদতরত ভাইকে সাহায্য করার জন্য এভাবে প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসছেন। সব শুনে রাসূল ﷺ বললেন—যদিও তুমি মসজিদে বসে ইবাদত করছ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তোমার থেকে অনেক ভালো আমলদার এবং তার ইবাদত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

এই দুটি ঘটনা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে, সক্ষম কোনো ব্যক্তির পরনির্ভরশীল হয়ে থাকার বিষয়টি ইসলাম অনুমোদন করে না; বরং ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়। রাসূল ﷺ বলেছেন—

> 'একজন ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করে যে রিজিক কামাই করে, তার থেকে উত্তম রিজিক আর কিছু হতে পারে না।'[৩]

তিনি আরও বলেন—

> 'যদি আল্লাহ তোমাদের কাউকে জীবিকা অর্জন করার মতো সুযোগ দেন, তাহলে সে যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে না থাকে; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তার সক্ষমতা থাকে, সে যেন পরিশ্রম করে যায়।'[৪]

এই হাদিসগুলোর মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জীবনে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের সুযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ইসলামে আল্লাহর ইবাদতের বিষয়টিকে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের উত্তম চরিত্র ও সদাচরণকে দেওয়া হয়েছে ইবাদতের মর্যাদা। আবার একই সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও নির্দেশনা মেনে পার্থিব কাজ করে যাওয়াকেও ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর কারণে সমাজের প্রতিটি সদস্য উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। অবকাশ পায় নিজেদের সম্ভাবনা ও যোগ্যতাগুলোকে কাজে লাগানোর। ফলে সমাজের প্রতিটি সদস্য সার্বিকভাবে সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সমাজের প্রতিটি সদস্যকে আত্মনির্ভরশীল এবং উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে প্রত্যেকের অংশগ্রহণকে সহজ করার জন্য ইসলাম সকলের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করে। সেইসঙ্গে ইসলাম প্রত্যেককে প্রয়োজন মতো সম্পূরক সম্পদ ও অবকাঠামোগত সহযোগিতাও প্রদান করে। সভ্যতার উন্নয়নে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনে প্রথম যে নিয়ামক এবং সম্পদকে কাজে লাগানোর প্রশ্ন আসে তা হলো—মানুষের জ্ঞান। এ কারণে ইসলাম নারী ও পুরুষ সকলের জন্য জ্ঞান অর্জন করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।[৫] আল কুরআনে সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে, তার মধ্যে দিয়েই জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যেমন : কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো তোমার পালনকর্তার নামে, যিনি মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।' সূরা আলাক : ১-৫

জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি কুরআনের নাজিলকৃত প্রথম এই আয়াতগুলোর মধ্যে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা প্রদান করেছেন। এই বিষয়গুলো দিয়ে প্রমাণ হয়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভালো করে বোঝার জন্যও পার্থিব জ্ঞান ধারণা থাকা জরুরি। পার্থিব জগৎ সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা রাসূল ﷺ-এর অনেক হাদিস থেকেও প্রমাণিত। মূলত ইসলামি সভ্যতার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনে জ্ঞানচর্চার ওপর। এই বইতে এর আগের অধ্যায়গুলোতে সভ্যতার অগ্রগতির নেপথ্যে মুসলমানদের ভূমিকাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

পাশাপাশি ইসলাম এমন কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কথা বলে, যা সমাজের প্রত্যেককে বস্তুগত সুবিধা প্রদান করবে—যাতে কেউ-ই উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। এসব সুবিধার মধ্যে অন্যতম—উত্তরাধিকারের নীতিমালা, যা মূলত একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় পূর্বাধিকার বা জ্যেষ্ঠাধিকারের একটি বিধান চালু আছে, যেখানে পিতা-মাতার স্থাবর সম্পত্তি শুধু বড়ো সন্তান পেয়ে থাকে। ইসলাম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান এবং পরিবারের সকল সদস্যদের অধিকাংশকেই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে হকদার হিসেবে ঘোষণা করে। স্থাবর সম্পত্তি পরিবারের কোন সদস্য কতটুকু পাবে—তা-ও ইসলামে পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া আছে। কাউকে সেই বিধিবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এমনকী যিনি সম্পত্তির মালিক, তিনিও যে কাউকে চাইলেই তার সম্পত্তি দিতে পারবেন না; যদিও পশ্চিমা জগতে এই ধরনের বিধান চালু আছে। একই সঙ্গে সম্পত্তির মালিক চাইলেই যে কাউকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতও করতে পারবেন না কিংবা মৃত্যুর আগে হুইল করে সম্পত্তি বণ্টনের প্রতিষ্ঠিত নিয়মে আমূল পরিবর্তনও আনতে পারবেন না।

সমাজের প্রতিটি সদস্য যেন উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে, সেইজন্য প্রয়োজনীয় সম্পূরক সুবিধাদি দেওয়ার পাশাপাশি ইসলামের আর্থিক বিধান এবং অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন ব্যক্তিপর্যায়ে সম্পদ কুক্ষিগত রাখার প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করে, অন্যদিকে আবার দরিদ্রতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগও সংকুচিত করে। অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মাঝে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার সুযোগ দানের মধ্য দিয়ে ইসলাম সম্পদ বণ্টনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা প্রণয়ন এবং দরিদ্রতা সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণটিকেই নস্যাৎ করে দেয়। গুটিকয়েক লোকের সম্পদ ভোগের পথ রহিত হয়ে যাওয়ায় বন্ধ হয় বসে বসে খাওয়ার সুযোগ। অন্যদিকে, সৃষ্টিশীল ব্যক্তিরা সম্পদ কাজে লাগানোর সুযোগ পাওয়ার কারণে একটি স্থাবর সম্পদ থেকে অনেকের পক্ষেই উপকারিতা পাওয়ার পথ তৈরি হয়।

মনে রাখতে হবে, সম্পূরক সম্পদকে যত বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে, তত বেশি সৃষ্টিশীলতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ইসলাম এভাবে সর্বাধিকসংখ্যক লোককে উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে। তাদের নতুন নতুন সৃষ্টির জন্য প্রেরণা জোগায়। ফলে ব্যাপক হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা—উন্নতি তখনই ন্যায়নিষ্ঠ হবে

এবং তখনই সকল শ্রেণির লোক উন্নয়নের স্বাদ পাবে—যখন উৎপাদনশীল সম্পদগুলোকে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

ইসলাম স্বীকার করে, সমাজে সব সময়ই কিছু কম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ থেকে যায়। বিশেষ করে সমাজে এমন মানুষ থাকবেই—যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে কিংবা যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয় কিংবা সামাজিক কোনো সমস্যার কারণে যারা হয় বাস্তুচ্যুত। আবার ভৌগলিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এমন কিছু লোকও সমাজে থাকে। যেমন : ইয়াতিম, বিধবা, মুরব্বি এবং বেকার সম্প্রদায়। এই অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলোর অবস্থান বিবেচনায় নিয়েই ইসলাম ব্যক্তি এবং সামষ্টিক পর্যায়ে এটাই নিশ্চিত করতে চায়, সম্পদ যেন কোনোভাবেই শুধু অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে জিম্মি হয়ে না থাকে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে—

> 'আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্য—যাতে ধন-সম্পদ কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।' সূরা হাশর : ৭

ব্যক্তি পর্যায়ের সংকট নিরসন করতে অধিক সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি ইসলামের নির্দেশনা প্রদান করে, যাতে তারা তুলনামূলক কম সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[৭]

মনে রাখতে হবে, এটা দরিদ্র বা কম সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি কোনো দয়া নয়; বরং এর মাধ্যমে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামতপ্রাপ্তির শুকরিয় আদায় করে। পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে ধনী ও দরিদ্র প্রতিটি মানুষেরই আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদা রয়েছে। এই কারণে কাউকে দান করার প্রক্রিয়াটিও এমনভাবে করতে হবে—যাতে করে যাকে দেওয়া হচ্ছে, তার সম্মানও সুরক্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ধনীদের সম্পদে অভাবীদের হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই কারণে যারা ধনী, তারা তাদের সম্পদের একটি অংশ অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হুকুম পালন করে, যা ইবাদতের শামিল। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ হলো জাকাত, যা প্রতিটি সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলমানকে আদায় করতে হয়।

একজন মানুষের সম্পদ যদি জাকাত দেওয়ার মতো পরিমাণে থাকে, তাহলে বছর শেষে তাকে আড়াই শতাংশ পরিমাণ জাকাত প্রদান করতে হয়। যদিও মোট সম্পদের কাছে আড়াই শতাংশ হয়তো খুব বেশি নয়, তবে আমি এখানে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবো, এই সামান্য অংশ দিয়েই সমাজ থেকে দরিদ্রতাকে পুরোপুরি নিরসন করা সম্ভব এবং তাতে ধনীদের সম্পদে কোনো ধরনের আহামরি প্রভাবও পড়বে না।

ইসলাম মূলত দারিদ্র্য নিরসনকে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদি কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী দরিদ্রতায় আক্রান্ত থাকে, তাহলে সামগ্রিকভাবে গোটা গোষ্ঠীকেই এই ব্যর্থতার দায় নিতে হবে। ইসলামে সবচেয়ে গর্হিত অপরাধ হলো—কুফরি করা। কুফরি মানে হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বকে অস্বীকার। রাসূল ﷺ বলেন—

> 'দরিদ্রতা কুফরির থেকেও বড়ো গুনাহ।'[৮]

রাসূল ﷺ-এর এই হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ হয়, ইসলাম দরিদ্রতাকে কোনোভাবেই বরদাশত করে না অথবা এভাবেও বলা যায়—যে পদ্ধতিতে সমাজের দরিদ্রতা অক্ষুণ্ন থাকে, সেই পদ্ধতির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আল্লাহর কর্তৃত্বকেই অস্বীকার করা হয়। তাই দরিদ্রতা টিকে থাকে—এমন কোনো আর্থিক পদ্ধতিকে ইসলাম অনুমোদন করে না।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করতে গিয়ে আমি বলতে চাই, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের ইতিবাচক সবগুলো বৈশিষ্ট্যই ইসলাম ধারণ করে। তবে এই মানবসৃষ্ট মতবাদগুলোর যে অপকারিতাগুলো আছে, ইসলাম তা থেকে মুক্ত। স্বাধীন ব্যাবসার পাশাপাশি বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সেইসঙ্গে নৈতিকতা চর্চার মধ্য দিয়ে ইসলাম এমন একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করে। একই সঙ্গে কার্যকর এবং ভারসাম্যপূর্ণ সম্পদের ওপর গুটিকয়েক ব্যক্তির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের আধিপত্যমূলক খবরদারিকে খারিজ করে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলাম সমাজকে স্বৈরশাসন ও আধিপত্যবাদের কবল থেকে রক্ষা করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে—ইসলামিক পদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা, যার মাধ্যমে মানবতার কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান দরিদ্রতা এবং সম্পদ বণ্টনে অসমতা

বর্তমানে প্রচলিত অর্থনৈতিক পদ্ধতিগুলোর কারণে যে জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যেভাবে দরিদ্রতা বেড়েছে, সম্পদ আয় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা মোকাবিলায় ইসলামের নীতিমালা কতটা কার্যকর—তা বোঝার জন্য আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিতে চাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। তাদের হাতে রয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি অর্থনীতি। এরপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিনিয়ত দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হতে হচ্ছে। একই সঙ্গে সেখানে ক্ষুধা, আবাসন সংকট, চিকিৎসা সংকটও ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয় ও সম্পদ বণ্টনে ভয়াবহ বৈষম্য রয়েছে—যা প্রতিনিয়ত আরও জটিল আকার ধারণ করছে।

দরিদ্রতা বলতে আমরা সেই পরিস্থিতিতে বুঝি, যেখানে একটি পরিবার জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাহিদাগুলোও পূরণ করতে পারে না কিংবা যেখানে মানুষের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানও বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এই সংজ্ঞার ওপর ভর করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই যারা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে, তাদের সন্দেহাতীতভাবে দরিদ্র বলে গণ্য করা হচ্ছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ-ও বলা হয়েছে, এই পরিবারগুলো ন্যূনতম পর্যায়ের খাবার বা পুষ্টি নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় শাকসবজিও জোগাড় করতে পারে না। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে সেই মানুষগুলো—যারা আবাসন, পোশাকাদি এবং স্বাস্থ্যসেবার খরচটাও বহন করতে পারে না।

দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৯ সালে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করে—যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম আয় বাৎসরিক ৮৫০১ ডলার। দুইজনের একটি পরিবারের জন্য ন্যূনতম বাৎসরিক আয় ১০৮৬৯, তিনজনের ১৩২৯০ এবং চার সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের জন্য ১৭০২৯ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়।[৯] এই মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৯ সালে হিসাবে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩ কোটি ২৪ লাখ লোক দরিদ্র—যা মোট জনসংখ্যার ১১ দশমিক ৮ শতাংশ।[১০]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৯৯ সালের আদমশুমারির তথ্য থেকে জানা যায়, দেশটিতে ৪ কোটি ২৬ লাখ লোক কোনো ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পায় না। এই সংখ্যাটি

দেশটির মোট জনসংখ্যার ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ।[১১] আরবান ইনস্টিটিউটের (২০০০ সালের)[১২] প্রতিবেদন অনুযায়ী—১৯৯৬ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০ লাখ লোক গৃহহীন অবস্থায় ছিল। এই সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে। কনফারেন্স অফ মেয়রের তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালে এই সংখ্যা আরও ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৩] ক্ষুধা, দারিদ্র এবং পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে কর্মরত টুফটস ইউনিভার্সিটি সেন্টারের[১৪] তথ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ২০ লাখ লোক মারাত্মক পর্যায়ের ক্ষুধার্ত থাকে এবং ৩ কোটি ৫ লাখ লোক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। এখানে মনে রাখতে হবে, যে পরিবারগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ধারিত দারিদ্রসীমার ওপরে অবস্থান করছে, তারাও যেকোনো সময় এই সীমার নিচে নেমে আসতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের একটি প্রতিবেদনে[১৫] জানা যায়, প্রতি ১০টি বাড়ির মধ্যে একটি বাড়ির সদস্যরা সেখানে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

দরিদ্রতার নিদারুণ বাস্তবতা মানবসম্পদ উন্নয়নে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পুষ্টিহীনতা বেড়ে গেলে স্বাস্থ্যসেবার মান কমে যায়। ফলে, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা বেড়ে যায়, রহিত হয় শিশুদের বিকাশ। যার করুণ পরিণতি হিসেবে অনেকেই অপরিণত বয়সে মারা যায়। এই বাস্তবতা জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রোগ্রামেও নেতিবাচকভাবে প্রতিফলিত হয়। ইউএনডিপির মানব-উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিশু মৃত্যু এবং মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক বেশি। সেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের গড় আয়ু অন্য অনেক দেশের তুলনায় কম। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধির হার বেশি, এরপরও বাস্তবতা হলো—দেশটিতে আর্থিক বৈষম্য অনেক প্রকট হওয়ায় অনেকেরই আর্থিক পণ্যসামগ্রী কেনার সামর্থ্য সেভাবে হয়ে উঠে না।[১৬]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে কেন এত উচ্চমাত্রায় দরিদ্রতা এবং খাদ্য সংকট বিরাজ করছে? আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যূনতম পারিশ্রমিক কাঠামোকে লক্ষ করি, তাহলেই এই সংকটের মূল কারণটি উপলব্ধি করতে পারব। সেখানে পারিশ্রমিকের পরিমাণ ঘণ্টা প্রতি ৫.৬৫ মার্কিন ডলার। যদি কোনো ব্যক্তি পুরো সময়টা কাজ করে অর্থাৎ সপ্তাহে যদি ৪০ ঘণ্টা কাজ করে, তাহলে প্রতিবছর তার মোট কর্ম সপ্তাহের সংখ্যা হয় ৫০টি। সেই হিসাবে, প্রতি সপ্তাহে তার আয় হবে ২২৬ মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ২৬ ডলার কেটে রাখা হবে সামাজিক নিরাপত্তা, স্বল্পমেয়াদি প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য কর আকারে। এই হিসেবে একজন ব্যক্তির বছরে আয় হয় ১০ হাজার মার্কিন ডলার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্রসীমার মানদণ্ড নিরূপণে দুই সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের জন্য যে খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে, এই আয় তার চেয়েও কম। ধরা যাক, এক বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দিতে প্রতিমাসে একটি পরিবারের ৫০০ ডলার খরচ হয়। সেই হিসাবে বছরে খরচ হবে ৬ হাজার মার্কিন ডলার। ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে পুরো বছরের অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য মাত্র ৪ হাজার ডলার অবশিষ্ট থাকে। যদি প্রতিমাসে খাদ্য খরচ বাবদ আমরা ৩০০ ডলার ধরে নিই, তাহলে বছরে খাবারের খরচ দাঁড়ায় ৩৬০০ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া ও খাবারের খরচের বিল দেওয়ার পর গোটা বছরের যাতায়াত, পোশাক-আশাক, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, গ্যাস বিলসহ যাবতীয় খরচ মেটানোর জন্য মাত্র ৪০০ ডলার অবশিষ্ট থাকে। অথচ এই সামান্য অর্থ দিয়ে এই সব খরচ মেটানো একেবারেই অসম্ভব। এমতাবস্থায় দরিদ্রতা সমাজের অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়।

একটি বেতন কাঠামো কীভাবে দরিদ্রতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, তা বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি-কাঠামো দিয়েই মূল্যায়ন করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবিভাগ বেশ লম্বা একটি সময়জুড়ে ন্যূনতম মজুরি কাঠামোর তালিকাগুলোকে সংকলন করেছে।[১৭] এই তালিকায় দেখা যায়—১৯৯৮ সালে দেশটিতে ন্যূনতম মজুরি-কাঠামো যা ছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে তা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সেই বেতনের পরিমাণ আরও কমে গেছে। ১৯৬৮ সালে ন্যূনতম মজুরি ছিল ঘণ্টা প্রতি ৭.৪ মার্কিন ডলার, ১৯৭৭ সালে এসে তা কমে হয় ৬.১৯ মার্কিন ডলার। ১৯৮৯ সালে হয় ৪.৪০ মার্কিন ডলার হাজার এবং ১৯৯৭ সালে কিছুটা বেড়ে হয় ৫.২৩ মার্কিন ডলার—যা ১৯৬৮ সালের সেই মজুরি-কাঠামোর তুলনায় কম। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ক্ষুধার্তের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ে কর্মরত টুফটস ইউনিভার্সিটি সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী—১৯৮৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২০ মিলিয়ন বা দুই কোটি। ১৯৯২ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩০ মিলিয়ন বা ৩ কোটি এবং ১৯৯৭ সালে এই সংখ্যা ৩৫ মিলিয়ন বা ৩ কোটি ৫০ লাখে উন্নীত হয়েছে।

এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির একটি বিশেষ দিকে তুলে ধরা দরকার, তা হলো—নব্বইয়ের দশকে যখন দেশটির অর্থনীতি অভূতপূর্ব গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, তখনও দেশটিতে দরিদ্রতা এবং ক্ষুধার সংকট ছিল প্রকট। দেশের অর্থনীতি এই সময়ে এসে স্থিতিশীল গতিতে ৪ শতাংশ হারে নিয়মিত প্রবৃদ্ধি লাভ করছিল,

বেকারত্বের হার অনেকখানি কমে এসেছিল, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছিল এবং সুদের হারও অনেক কমানো হয়েছিল।

১৯৮৯ সালের আলোকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের আয় ও সম্পদের হার

বিষয়	শীর্ষ ২০%	শীর্ষ ১%	শীর্ষ ৫%	নিচের দিকে ২০%	নিচের দিকে ৮০%	নিচের দিকে ৯৫%
আয়	৫৫.৫	১৬.৪	২৯.৭	৩.১	৪৪.৫	৭০.৩
সম্পদ	৮৪.৬	৪০.৯	৬২.৮	-১.৪	১৫.৪	৩৭.২
অর্থ-সম্পদ	৯৩.৯	৪৮.১	৭২.২	-২.৩	৬.১	২৭.৮

তাহলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল কে বা কারা পায়? ওপরে টেবিলটিতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই টেবিলটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯৮৯ সালের হিসাবের আলোকে। ওলফ এই বিষয়ে সর্বশেষ নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।[১৮] যুক্তরাষ্ট্রের ওপরের দিকে শীর্ষ ২০ শতাংশ পরিবার মোট জাতীয় আয়ের ৫৫.৫ শতাংশ উপভোগ করে। এর বিপরীতে নিচের দিকে ২০% পরিবার জাতীয় আয়ের মাত্র ৩.১ শতাংশ ভোগ করতে পারে। সম্পদের বণ্টনের হার আরও জঘন্য। ২০% ধনী ৮৪.৬ শতাংশ সম্পদ করায়ত্ত করে রেখেছে। আর নিচের দিকের ৯৫% মানুষ মাত্র ৩৭.২ শতাংশ সম্পদ ভোগ করতে পারে। দেশটির অর্থ-সম্পদ বণ্টনের মাত্রাও ভালো নয়। অর্থ-সম্পদের ৯৩.৯% ভোগ করে ২০% ধনী আর ২৭.৮ শতাংশ অর্থ-সম্পদ ভোগ করে দেশটির ৯৫ ভাগ মানুষ।

পরিসংখ্যানে আরও জানা যায়, জাতীয় আয় এবং সম্পদের ভারসাম্যহীনতা নব্বইয়ের দশকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৯] পাশাপাশি তখন মজুরি বা পারিশ্রমিকও ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছিল। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকতা বা সিইওকে তখন আকাশচুম্বী বেতন দেওয়া হতো। ১৯৯৬ সালের হিসাবে দেখা যায়, একটি কোম্পানির সিইওকে বাৎসরিক ৫.৬ মিলিয়ন ডলার বেতন দেওয়া হতো। ১৯৬০ সালে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে সাধারণ শ্রমিকের মজুরির অনুপাত ছিল ৪৪ : ১, যা ১৯৯৬ সালে এসে হয়ে যায় ২০১ : ১। অন্যদিকে আশি-নব্বইয়ের দশকে এসে করের বোঝাটি ধারাবাহিকভাবে ধনী সম্প্রদায়ের ওপর থেকে কমে গিয়ে উলটো মধ্যবিত্তের ওপর উচ্চহারে আরোপিত হতে শুরু করে।[২০]

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামি সমাধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈষম্য

ইসলামি জীবন-দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যখনই একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি এবং যথার্থভাবে বিকশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তখন বাকি বিষয়গুলো এমনিতেও স্বাভাবিক হয়। মানসম্পন্ন সেই ব্যক্তির পক্ষে তখন অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করাও সহজ হয় এবং সেইসাথে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকেও সে তখন সচেতনভাবে পরিত্যাগ করতে পারে। এই কারণে যেকোনো একটি নীতিমালাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে সবার আগে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়কে বিষয়টা অবহিত এবং তারপর সমাজের সচেতন ও দায়িত্বশীল সদস্যদের মাধ্যমে সেই কাজটিকে বাস্তবায়নের পথে নিয়ে যাওয়া হয়।

কিন্তু কোনো পদ্ধতি যদি এতটা গোছানো না হয়, তাহলে তৈরি হয় সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদি ইসলামিক নীতিমালাকে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে আমাদের বাহ্যিকভাবে তত্ত্বাবধান করার যে পদ্ধতি রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করতে হবে। যেহেতু পশ্চিমা জগতের বিদ্যমান পার্থিব ও বস্তুগত সমাজব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ ও স্বার্থটিকেই কেবল বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাই সেখানে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য একজন ব্যক্তিকে বর্তমানে নির্ধারিত হারের তুলনায় একটু বেশি মাত্রায় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে, আমি দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য দূরীকরণে ইসলামে যেসব কৌশল রয়েছে—সেগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। যদিও যে সমাজব্যবস্থায় ইসলামি অনুশাসনকে অনুসরণ করা হয় না, সেখানে বাহির থেকে ইসলামি কোনো কৌশলকে আরোপ করা খুব একটা সহজ নয়। এর আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার যে সংকটগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তার সমাধানকল্পে আমি জাকাতের প্রসঙ্গটিকেই সামনে নিয়ে আসতে চাই। কেননা, জাকাত পদ্ধতিতে একজন মানুষকে খুব সামান্য পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর জাকাতের প্রক্রিয়াটির বাস্তবায়ন করাও তুলনামূলক সহজ।

ইসলামে সম্পদের উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিস্তৃত সুযোগগুলো রাখা হয়েছে, তার মাধ্যমেই সমাজের বৈষম্য ও দরিদ্রতাকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে নিয়ে আসা যায়। একইভাবে, সম্পদের আয় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার যে বিধানগুলো জারি করেছে, তার বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেও সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার পথ বন্ধ করা সম্ভব এবং দরিদ্রতার কষাঘাত থেকে মানুষকে অনেকখানি মুক্ত করাও বাস্তবসম্মত। জুয়া, উৎপাদন বাণিজ্য, মাদক ব্যাবসা,

মজুতদারি এবং বাজারে অস্থিতিশীলতা তৈরির মাধ্যমে যেভাবে সমাজে কেউ কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে, ইসলামি অনুশাসন প্রয়োগ করার মাধ্যমে তার শিকড় উৎপাটন করা সম্ভব।

মূলত ক্রেতারাই বাজারের পণ্যের সরবরাহ ও জোগান নির্ধারণ এবং তার আলোকে ভর্তুকিও প্রদান করবেন। ক্রেতার মানসিকতা, সামর্থ্য ও অভিরুচিকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। আমরা ব্যক্তিবিশেষকে সংশোধন করার মাধ্যমে মাদকের উৎপাদন ও ব্যাবসা বন্ধ করতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা দেশে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালণা করতে গিয়ে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে, তা দিয়ে নিজ দেশে দরিদ্র বিমোচনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিল।

পাশাপাশি, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যে বিষয়টি বলতে চাই—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজ দেশেও মাদক নির্মূল অভিযানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এবং মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে হাজারো তরুণকে চিকিৎসা দিতে গিয়েও একটি বড়ো অঙ্কের অর্থ খরচ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি ব্যক্তিবিশেষকে সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারতাম, তাহলে মাদকাসক্ত যুবক সম্প্রদায় উলটো দেশটির উৎপাদক শ্রেণিতে পরিণত হতো। ফলে দরিদ্রতার হার যেভাবে হ্রাস পেত, ঠিক একইভাবে আবার পরিবারগুলো বড়ো আকারের বিপদ থেকেও মুক্তি পেয়ে যেত।

এই কাজগুলো সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজন ইসলামি শিক্ষা এবং ইসলামি ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কিন্তু ইসলামি শিক্ষা ও বিকাশের চর্চা যদি না-ও থাকে, তাহলেও অন্তত ইসলামের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর (স্বেচ্ছাসেবী এবং বাধ্যতামূলক) মাধ্যমেও সমাজের বিদ্যমান ভারসাম্যকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে এমন কিছু কল্যাণমুখী বিধান আছে—যার মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা হয়। সামর্থ্যবান মানুষেরাও স্বেচ্ছায় এই ধরনের দাতব্য কার্যক্রমে অংশ নেয়। কিন্তু সমস্যা হলো—এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্রদের সাহায্য করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের দরিদ্রতার অভিশপ্ত শিকলের বাইরে নিয়ে আসার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে দরিদ্রতার মূল যে সংকট—তা আগের মতোই বজায় থাকছে।

এমতাবস্থায়, মার্কিন অর্থনীতিতে জাকাতের বিধান চালু করা হলে শুধু যে দরিদ্র বিমোচন হবে তা-ই নয়; বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনের মূল স্রোতধারায়

নিয়ে আসাও সম্ভব। তা ছাড়া জাকাতের ক্ষেত্রে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের তাদের সম্পদের যৎসামান্য অংশই দিতে হয়। ফলে, জাকাতাদাতা ব্যক্তির ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়ে না এবং সম্পদ ভোগ করার ক্ষেত্রেও কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয় না। জাকাতের মাধ্যমে একেবারে হতদরিদ্র শ্রেণিও উন্নয়নের সোপানের দেখা পায়। প্রচলিত আর্থিক বিধানে প্রবৃদ্ধি যেভাবে প্রতিবছর হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তেমন কোনো ঝুঁকিও জাকাতের ক্ষেত্রে নেই; বরং জাকাতের স্বার্থক বাস্তবায়নে অর্থনীতির একটি সামগ্রিক উন্নতি লক্ষ করা যায়।

জাকাতকে কল্যাণমুখী কর বা রাজস্ব হিসেবেও অভিহিত করা যায়। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপরে জাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক। সমাজে নীতিনির্ধারণী মহল বা কর্তৃপক্ষ সামর্থ্যবানদের কাছ থেকে এই করটি আদায় করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো নির্মাণ করবে। জাকাতের আওতায় একজন ব্যক্তিকে বছর শেষে তার সম্পদের মাত্র আড়াই শতাংশ কর প্রদান করতে হয়। রাসূল ﷺ-এর সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদার সময়েও জাকাত পদ্ধতি থেকে ব্যাপক পরিমাণ সফলতা পাওয়া গিয়েছিল। দেখা যায়, তৎকালীন সময়ে জাকাত চালু করার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছিল, জাকাত নেওয়ার মতো লোকও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই যুগে ইসলামের অর্থনীতির কাঠামো বর্তমান সময়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনার থেকে অনেক বেশি অর্থশালী ও প্রাচুর্যময় ছিল।

একারম্যান এবং এলসটট[২১] প্রচলিত আয়করকে প্রতিস্থাপন করে কল্যাণমুখী কর ধার্য করার জন্য যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেখানে তারা উইলহেলম'র[২২] বেশ কিছু পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছেন। জাকাত চালু করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে কী প্রভাব পড়তে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি সেই পরিসংখ্যানগুলো তুলে ধরব।

বছরে ৮০ হাজার ডলার অবধি আয়কে করমুক্ত রেখে তারা দেখিয়েছেন, মাত্র ২% কল্যাণকর দিয়ে প্রতিবছর ৩৭৮ বিলিয়ন ডলার পরিমাণ রাজস্ব আয় করা সম্ভব। আমরা যদি এটাকে জাকাতের ২.৫ শতাংশ হারে নির্ধারণ করি, তাহলে সংগৃহীত জাকাতের পরিমাণ হবে ৪৭২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিশাল পরিমাণ অর্থ যদি দেশটির ৩২.৪ মিলিয়ন বা তিন কোটি ২৪ লাখ দরিদ্র লোকের মাঝে বিতরণ করা হয়, তাহলে প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তিকে বছরে ১৪ হাজার ৫৮৩ ডলার করে প্রদান করা সম্ভব। অন্যদিকে, তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারকে

বার্ষিক ৪৩ হাজার ৭৫০ ডলার পরিমাণ অর্থ প্রদান করা সম্ভব হবে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে, মাত্র এক বছরের মধ্যেই গোটা সমাজ থেকে দরিদ্রতা নিরসন করা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধু দরিদ্র পরিবারগুলোকে সাহায্য করাই হবে না; বরং তাদের পেছনে এমনভাবে বিনিয়োগ করা হবে—যার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তারা ক্রমশ উৎপাদনমুখী শ্রেণিতে পরিণত হবে। এভাবে টানা কয়েক বছর জাকাত প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজ থেকে দরিদ্রতার হার সম্পূর্ণরূপে হ্রাস পাবে। একটা সময়ে গিয়ে সরকার বা নীতিনির্ধারক কিংবা বাইরের কোনো মহল থেকে দরিদ্র পরিবারগুলোকে আর সাহায্য করার প্রয়োজন পড়বে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা আইনের সাথে জাকাতের তুলনা করার জন্য আমরা দুটো আলোচিত প্রকল্পকে বিবেচনায় নিতে পারি। একটি প্রকল্পের নাম হলো 'এইড টু ফ্যামিলিজ উইথ চিলড্রেন' আর দ্বিতীয়টি হলো 'ফুড স্ট্যাম্পস'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলো ১৯৯৬ সালে এই প্রকল্প দুটো বাস্তবায়নে ৪০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের সংস্কার নিয়ে আসায় এই ব্যয়ের পরিমাণ সাম্প্রতিককালে আরও কমে এসেছে। সে যাহোক, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাকাত বাবদ সম্ভাব্য যে আয় অনুমান করেছিলাম, সেই অনুযায়ী এই প্রকল্প দুটোতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেকটাই কম। তাই জাকাতের বিপুল অর্থ দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করা সম্ভব হতো, তা এই সামান্য অর্থ দিয়ে কখনোই করা যাবে না। এদিক দিয়ে জাকাত সব সময়ই এগিয়ে থাকবে।

জাকাতের মাধ্যমে শুধু দরিদ্রতা বিমোচন করা যাবে তা-ই নয়; বরং সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যকেও অনেকখানি হ্রাস করা সম্ভব হবে। বৈষম্য নিরসনের এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতেই হবে। কেননা, জাকাতের মাধ্যমে নিচ থেকে ওপরের দিকে বৈষম্য হ্রাস করা হয়। অন্যদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে ওপর থেকে নিচের দিকে বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করা হয়। ওপর থেকে নিচে বৈষম্য দূর করতে গেলে সমাজের অভিজাত শ্রেণি আপত্তি তোলেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করারও চেষ্টা করেন। কিন্তু নিচ থেকে ওপরের দিকে যদি বৈষম্য কমানোর চেষ্টা করা হয়, তাহলে সমাজের প্রতিটি সদস্যই বিষয়টিকে স্বাভাবিক ও সহজভাবে গ্রহণ করেন।

আরেকটি বিষয়ও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ কারাবন্দি মানুষের পেছনে ৭০ বিলিয়ন ডলার অর্থ ব্যয় করে। জাকাতের মাধ্যমে দরিদ্রতা বিমোচন করা সম্ভব হলে আশা করা যায়, কারাবন্দি মানুষের সংখ্যা কমে আসবে। ফলে এই খাত থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থও বেঁচে যাবে—যা পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়, জাকাতের মাধ্যমে অনেক ধরনের উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব। একদিকে জাকাতের মাধ্যমে যেমন দরিদ্রতা নিরসন করা যাবে, অন্যদিকে প্রতিনিয়ত এই সমস্যাগুলোর কারণে সমাজের মানুষেরা যেসব ভোগান্তির শিকার হচ্ছে—তা থেকেও অনেকটাই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে।

উপসংহার

আমি এই অধ্যায়টি শেষ করতে চাই এই বলে, আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরে ইসলামের অর্থনৈতিক পদ্ধতি শুধু কার্যকরই নয়; বরং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানেও ইসলামি অর্থনৈতিক পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। আধুনিক অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে খুবই জটিল এবং প্রতিনিয়ত এটি আরও জটিল আকার ধারণ করছে। সেইসঙ্গে আধুনিক অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াবলিও ক্রমশই সমাধানের অযোগ্য হয়ে উঠছে। এর মূল কারণ—আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই অগ্রাহ্য করে গেছে—আত্মার পরিশুদ্ধতা।

আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে উঠেছে, মানুষ বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ডারউইনের 'সারভাইবাল অব দ্যা ফিটেস্ট' বা 'যোগ্যরাই টিকে থাকবে' শীর্ষক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ আর ক্ষমতা অর্জনের জন্য মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। কোনো ধরনের নৈতিকতার অস্তিত্ব না থাকায় আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগুলো এমন কিছু সমস্যা তৈরি করেছে, যা সমাধান করা আর কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে একের পর এক কঠোর থেকে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। আইন অমান্য করলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারপরও মানুষকে সংযত করা যাচ্ছে না; বরং বস্তুগত সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জন করার জন্য সমাজের মানুষেরা প্রতিনিয়ত আইন অমান্য করতেও কার্পণ্য বোধ করছে না।

এর বিপরীতে ইসলামিক পদ্ধতি অনেক বেশি সহজ এবং সকলের জন্যই প্রণিধানযোগ্য। ইসলামের চেতনা মানুষকে এমনভাবে ঐশ্বরিক বিধিবিধানের সাথে সম্পর্কিত করে, সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতিই প্রতিনিয়ত এর উপকার পেতে থাকে। পাশাপাশি, ইসলামিক পদ্ধতিতে সমাজকে এমনভাবে পরিচালনা করা হয়, যাতে মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটতে পারে। ফলে ইসলামিক পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আধুনিক অর্থনীতিতে সৃষ্ট অনেক সমস্যারই সমাধান করা যায়। যার অনিবার্য পরিণতিতে, নিছক প্রবৃদ্ধির খোলসে ঢাকা স্লোগানমুখী উন্নয়ন নয়; বরং সামগ্রিকভাবে গোটা অর্থনীতিকে উন্নত এবং সকল শ্রেণির মানুষ এর সুফল ভোগ করার সুযোগ পায়। শুধু ইসলামি অর্থনীতির একটি প্রতিষ্ঠান তথা জাকাতের মাধ্যমেই এই বাস্তবতা অনেকখানি প্রমাণ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

1. Dudley Seers, 'The Meaning of Development,' International Development Review (1969), pp. 3-4
2. UNDP (United Nations Development Program), Human Development Report 1991, (New York : Oxford University Press, 1991)
3. Muhammad Muhsin Khan, *The Translation of the Meanings of Sahih-al-Bukhari* (Beirut: Darul Arabia, 1985), vol.3, Hadith Number 286, p. 162
4. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah *(Riyadh; Sharikah al Tibaáh al Arabiyyah as Saudiah*, 1984) vol.2 p-7
5. Ibn Majah and Bayhaqi, al Tirmidhi (Alim CD, Release 4, 1996)
6. Ali, Abdullah Yousuf, *The Meaning of the Glorious Quran* (Cairo: Darul Kitab al Masri, 1934) Vol-1, 2:76
7. Bukhari, p.52:112; Cairo
8. Muhammad Asad, *The Principles of State and Governance in Islam* (Gibralter: Dar Al al Andalus, 1980)

9. US Census, Current Population Survey, March 1999 and 2000 (U.S. Bureau of Census, 2000)

10. একই তথ্যসূত্র

11. একই তথ্যসূত্র

12. Urban Institute, Millions Still Face Homelessness in a Booming Economy

13. Mayors 16th Annual Survey on 'Hunger and Homelessness in America's Cities'

14. CHPNP, Hunger in the US (Boston, MA : Tufts University on Hunger, Poverty and Nutrition Policy, 2001)

15. USDA, Prevalence of Food Insecurity and Hunger, by state 1996-98 (USA: US Department of Agriculture, 1998)

16. UNDP (United Nations Development Program), Human Development Report 1991, (New York: Oxford University Press, 2000)

17. BLS (Bureau of Labor Statistics), Value of the Federal Minimum Wage, 1938-1997 (USA: US Department of Labor, 2000)

18. Edward N. Wolff, Economics of Poverty, Inequity and Discrimination (Cincinnati, OH: Southwestern Publishing, 1997)

19. Chuck Collins, Besty Leonard Wright, & Holly Sklar, Shifting Fortunes: The perils of the Growing American Wealth Gap (Boston, MA: United for a fair economy, 1999)

20. Donald Barlett & James Steele, America: Who Really Pays the taxes? (New York: Simon & Schuster, 1994)

21. Bruce Ackerman & Anne Alstott, *The stakeholder Society* (New Haven, CT: Yale University Press, 1999)

22. Mark Wilhelm, 'Estimates of Wealth Tax' (unpublished paper, Pennsylvania State University, University Park, 1998)

শেষ কিছু কথা

দিলনেওয়াজ এ. সিদ্দিকি

এই বইতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে, মৌলিক ও ফলিতবিদ্যা এবং জীববিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ধ্যানধারণাসমূহ বিভিন্ন অনুকরণীয় মডেল এবং প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে মুসলমানদের অবদানগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচনার এই পর্যায়ে, ইসলামি অনুশাসনের ভিত্তিতে সামাজিক শৃঙ্খলা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়—সেই বিষয়ে আমরা মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব।

একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল জীবন-কাঠামোর ভিত্তি হলো—আল্লাহ তায়ালার সাথে সহজাত সম্পর্ক, আশেপাশের মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য প্রাণী ও পরিবেশের নানা উপাদান-উপকরণের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। পাশাপাশি, প্রয়োজন অনেকগুলো সর্বজনীন নীতিমালা—যার মধ্যে অন্যতম হলো স্বাধীনতা; ইতিবাচক মানবিক গুণাবলি এবং মানুষের অমিত সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। যদি এই সবগুলো বিষয় একসঙ্গে যথাযথভাবে সংগঠিত করা যায়, তাহলেই জীবনের একটি অর্থবহ উদ্দেশ্য তৈরি হয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বুদ্ধিমত্তা এবং আধ্যাত্মিক সক্ষমতার ভেতর দিয়েই জীবনকে সঠিকভাবে এবং সঠিক দিকে পরিচালনা করা সম্ভব।[১]

ইসলাম পৃথিবীতে প্রাতিষ্ঠানিক ধারণার সংজ্ঞাকে পালটে দিয়েছে। বাতলে দিয়েছে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের ধরন। পাশাপাশি কীভাবে তাওহিদের মতো একটি এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোনো যায় কিংবা মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়—ইসলাম তা দেখিয়ে দিয়েছে। ইসলাম আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভর করে চরিত্র বিনির্মাণ এবং ব্যক্তির জবাবদিহিতাকে নিশ্চিত করেছে। কীভাবে একজন মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, অপরের গুণাবলিকে কীভাবে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগাবে—তা-ও ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলাম জানিয়েছে, এই বিশ্বজগতে আল্লাহপাক যত নিয়ামত দান করেছেন, তার সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এই সব সম্পদের অপচয় বা অপব্যয় করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

ইসলামের এই বর্ণিত নীতিমালাগুলো বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই মুসলমানরা আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো পুনর্নির্মাণ করেছে এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য এই কাঠামোগুলোকে সার্থকভাবে রূপান্তরও করেছে। ইসলামের এই অতুলনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ লিঙ্গ, গোত্র, জাত, বর্ণ ধর্মের ভেদাভেদ থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। ইসলাম এই সব জাত-পাতকে কখনোই মূল্যায়নের মানদণ্ড মনে করেনি; বরং খলিফা হিসেবে মানুষের যে ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যগুলো রয়েছে—তা কে কতটা পালন করল, সেই বাস্তবতাকেই সফলতা বা ব্যর্থতার নির্ণায়ক হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ইসলাম পরিবারকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। একেবারে শিশু অবস্থা থেকে শুরু করে পরিণত হওয়া পর্যন্ত একজন মানুষ কীভাবে চলবে, ইসলাম পারিবারিক শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে তাই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সুষ্ঠু ও মার্জিত আইন-কানুন থেকেই ভালো প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর উৎপত্তি হয়। আর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যথার্থ হলেই এখান থেকে উত্তম মানুষ বের হয়ে আসতে পারে। এই উত্তম মানুষগুলোই আবার সমাজের সর্বত্র ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে স্বাধীনতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ইউরোপিয়ানদের ওপরে মুসলমানদের প্রভাব সম্পর্কে রোজ ডব্লিউ লেন বলেন—

> 'মুসলিম ভূখণ্ডে ক্রুসেড অভিযান শেষে ইউরোপিয়ানরা যখন নিজ ভূমিতে ফিরে আসে, তখন সেই মুসলিম ভূখণ্ড থেকেই তারা জেন্টেলম্যান তথা ভদ্র মানুষের ধারণাকে আমদানি করেন।

সিরিয়ার মুসলমান সভ্যতায় অভিযান চালানোর আগ পর্যন্ত ইউরোপের এই মানুষগুলো জানতই না—বর্বর না হয়েও একজন মানুষ বলিষ্ঠ হতে পারে। মুসলমানরা যোদ্ধা হিসেবে খুবই উঁচু মানের, কিন্তু তারা কখনোই নিষ্ঠুর ছিল না। তারা বন্দিদের ওপর নির্যাতন করত না। তারা আহতদের হত্যা করত না। মুসলমানরা নিজেদের দেশে কখনোই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষগুলোর ওপর অত্যাচার চালাত না। তারা সাহসী ছিল, কিন্তু একইসঙ্গে তারা ছিল বিনয়ী ও মার্জিত। তারা নিজেরা সম্মানিত ছিল এবং অপরকেও সম্মান করতে পারত। তারা সত্য কথা বলত এবং কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা-ও রক্ষা করত।'[২]

ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ইতালিয়ানরাই সর্বপ্রথম প্রাচ্যের মুসলমানদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, তারা মুসলমানদের চরিত্র দেখেই প্রাথমিকভাবে মুগ্ধ হয়। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের জীবনযাপনের ওপরও মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লেন আরও বলেন—

'সম্ভবত পৃথিবীতে সবচেয়ে ভদ্র মানুষ হিসেবে ব্রিটেনের অভিজাত নারী-পুরুষদেরই গণ্য করা হয়। এই ব্রিটিশ সম্ভ্রান্ত মানুষগুলোকে দেখলেই আজকের আমেরিকানরা কিছুটা আঁচ করতে পারবে—ইতালিয়ানরা সেই সময় কতটা উঁচু মানের মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিল।

ইতালিয়ান বণিক, ব্যবসায়ী ও নাবিকরা আরবের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বাণিজ্য করতে গিয়ে প্রথম উন্নত এই মানুষগুলোর দেখা পায়। তখন থেকে তারা এমন কিছু মানুষের সংস্পর্শ পায়, যারা তাদের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ, ধনী মার্জিত পোশাক পরিহিত। যারা ভালো মানের খাবার খায় এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মুসলমানরা হলো সেই মানুষ, যারা গভীরভাবে ভাবতে পারত এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারত। চিন্তার দিক থেকে মুসলমানরা ছিল স্বাধীন। মুসলমানরা জানত—কীভাবে নৌপথে জাহাজ চালাতে হয়। সেইসঙ্গে যেকোনো হিসাব-নিকাশ এবং খরচ নির্ধারণেও মুসলমানরা ছিল পারদর্শী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমানরা দূর-দূরান্তে নিজেদের ব্যাবসা-বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করতে পেরেছিল।'

মুসলমানদের যেকোনো কাজ বিশেষ করে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ কোনো কাজই নৈতিকতামুক্ত বা নীতিহীন ছিল না। জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে তাদের একটি সঠিক নির্ধারিত প্রক্রিয়া ছিল, আবার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও তাদের কিছু নীতিমালা ছিল।

তৎকালীন মুসলিম সমাজে মহিলারা স্বাধীন ছিলেন এবং তাদের শিক্ষার হার এতটাই বেশি ছিল, তারা চাইলে যেকোনো ধরনের শালীন ও মার্জিত পেশায় সম্পৃক্ত হতে পারতেন। অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করার জন্য তারা নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে সুরক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায়ও যেতে পারতেন। অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সদস্যরা হেফাজত করার চেষ্টা করতেন। মুসলমানদের ওপর একরকম দায়িত্বই অর্পণ করা হয়েছিল—যাতে তারা সংখ্যালঘুদের জীবন, ভূমি ও চলাচলের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে।

সেই সময়ের মুসলিম সমাজে লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং অন্যান্য সামাজিক পার্থক্য নির্বিশেষে সকলের জন্যই শিক্ষা ছিল সহজলভ্য। এমনকী ক্রীতদাসরাও এতটাই সুবিধা পেত, তারা দেশ পরিচালনার সুযোগ পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছিল। মুসলিম ভারতে অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কি থেকে আসা ক্রীতদাস বংশের যে উত্থান হয়েছিল এবং একইভাবে ১৩ থেকে ১৬ শতাব্দী পর্যন্ত মিশরে মামলুকদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা ইসলামের সর্বজনীনতা এবং বহুমুখিতারই সাক্ষ্য দেয়। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত ইতিহাস গবেষক ফিলিপকে হিট্টি[৩] মামলুকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—

> 'গতকাল পর্যন্ত যে সম্প্রদায় ছিল নেহায়েতই ক্রীতদাস, তারাই আজ সেনাপতির আসনে বসেছে এবং আগামীকাল তারাই সুলতানের দায়িত্ব বুঝে নেবে।'

ইসলামে ইবাদতের বিষয়ে একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়া রয়েছে, যার সাথে সব ধরনের প্রশংসনীয় কাজ এবং জীবনের প্রতিটি স্তরের সাথে ঘটানো হয়েছে ঐশ্বরিক নির্দেশনার সম্মিলন। ইসলামের এই অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিকতা এবং আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যেও একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামোতে নৈতিকতা ও পার্থিব বিষয়াবলিকে আলাদা করা হয়নি। ফলে ইসলাম মানবতাকে সবচেয়ে উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। ইসলাম সমস্ত কাজের ব্যাপারে মানুষের বিবেকবোধ এবং বিবেকের অনুশীলনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

এর আগে নিছক ভয় ও বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃতির নানা উপাদানের বা কোনো মূর্তি বানিয়ে তার ইবাদত করার যে ইতিহাস ছিল, ইসলাম তা নস্যাৎ করে। ফলে ইসলাম মুসলমানদের সব ধরনের দাসত্ব, পরাধীনতা এবং ভয় ও আশঙ্কা থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি প্রদান করেছে।[৪] যার পরিণতিতে, বিভিন্ন গোত্রের, ধর্মের এবং নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর লোকেরাও ইসলামের ছায়াতলে স্বাধীনভাবে আসতে পেরেছে। এভাবে কালক্রমে ইসলাম নানা রং ও বর্ণের একটি বিচিত্র রংধনুর রূপ লাভ করেছে।

আল্লাহর কাছে সব গোত্র ও জাতের মানুষই সমান। কেবল মানুষের নেক আমলের ওপর ভিত্তি করে আল্লাহ তায়ালা কিছু ব্যক্তিকে বাড়তি সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। এই সাম্যের নীতির কারণে ফলে মুসলমানরা এমন একটি সমাজ-কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে কোনো ধরনের শ্রেণিবৈষম্য এবং মানসিক জটিলতার অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না কারও পক্ষে ক্ষমতার বাহাদুরি দেখানোরও কোনো সুযোগ। আবার অসহায় বা তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার কারণে কাউকে বিচ্ছিন্ন করেও রাখা যেত না।

মানুষের ভেতর যে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো আছে, তার কাছে পরাজিত না হয়েও মুসলমানরা আল্লাহ প্রদত্ত সকল মেধা ও সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। এর প্রমাণ, মুসলমানরা তাদের সোনালি যুগের প্রতিটি মানবিক কার্যক্রম করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সফলতা লাভের মাধ্যমে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

মানবিক বিভিন্ন কার্যক্রমে ইতঃপূর্বে যে চরমপন্থার প্রভাব ছিল, ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর সংস্কৃতি তাকে ভূলুণ্ঠিত করে দেয় এবং টানা কয়েক শতাব্দী ধরে মানবজাতিকে নানা ধরনের অযাচিত সংকট ও সমস্যা থেকেও মুক্ত রাখে। বিশ্বজুড়ে বর্তমানে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি হওয়ায় একটি সামগ্রিক উন্নয়নের সুযোগও তৈরি হয়েছে। ফলে মানুষের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিষয়াবলির ভেতরে একটি সমন্বয় ঘটে। ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনযাপন তো বটেই, এমনকী আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বনের তাগিদ দেয়।

ইসলাম এমন কিছু শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা ন্যায়বিচারকে শুধু ব্যক্তিপর্যায়ে নয়; বরং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে। নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য এবং স্বার্থ হাসিল করার লোভে অন্যের সম্পত্তি জোরপূর্বক হরণ করার ওপর

ইসলাম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ইসলাম সার্থকভাবে ব্যক্তির ভেতরকার উগ্রপন্থাকে দমন করে। ইসলাম আত্মকেন্দ্রিকতাকে অগ্রাহ্য এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং ঐশ্বরিক বিধানের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করে। অন্যের কাছ থেকে নিজের অধিকার বুঝে নেওয়ার আগে ইসলাম বরং অপরের প্রতি নিজের দায়িত্বগুলো করার জন্য অধিক তাগিদ দেয়।

নিছক ভালো কিছু পাওয়ার অজুহাতে কোনো ধরনের অপকৌশল বা অসদুপায়ের অবলম্বন ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম স্বাধীনতা, সম্পদ, ক্ষমতা, আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণকে কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবে গণ্য করে না; বরং এগুলোকে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানোর একটি নিয়ামক বা উপকরণ হিসেবেই বিবেচনা করে। মানুষের হাতে যে কৌশলগুলো কিংবা যে সুযোগগুলো আছে, সেগুলোকে ইসলাম বরাবরই ইতিবাচকভাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয়। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো—মুসলমানদের এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা আধ্যাত্মিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অপর মুসলমানের সঙ্গে এমনকী অমুসলিমদের সাথেও ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে।

ইসলামের মূল্যবোধগুলো বিশ্বাসী মানুষগুলোকে লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ইসলাম পরিবারকে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে, যেখানে দম্পতিরা নিজেদের সাথে শত্রুতাভাবাপন্ন আচরণ করবে না; বরং একে অপরের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সংসার পরিচালনা করবে। ইসলাম এমনভাবে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও একাগ্রতাকে জাগ্রত করে—যাতে মানুষ প্রতিটি কাজ ধ্বংসাত্মকভাবে নয়; বরং ইতিবাচকভাবেও পরিচালনা করতে পারে। ইসলাম নারী-পুরুষ সবাইকেই প্রতিটি জায়গায়—বিশেষ করে বাহ্যিক অবয়ব, খাওয়া দাওয়া, পোশাক, কথাবার্তা, এবং চলাফেরায় মার্জিত হওয়ার তাগিদ দেয়। ইসলাম নারী-পুরুষের চলাফেরাকে এমনভাবে পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়—যাতে বিয়ের পূর্বে উভয়ের মধ্যে কোনো ধরনের শিথিলতা না দেখা যায়, আবার বিয়ে পরবর্তী সময়েও কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া হয়।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক, মুসলমানরা তাদের চারপাশের মানুষের মাঝে ইসলামের সর্বজনীন চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদানকেও তুলে ধরতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়; মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ তাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কেও অবহিত নয়। মুসলমানদের সেই অচলায়তনের অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

মুসলমানদের সমাজ-সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলবে না; বরং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে নিয়মিতভাবে মতবিনিময় করতে হবে এবং সামষ্টিক অর্থে ইসলামের মূল্যবোধের প্রয়োগ ও অনুশীলন করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই বর্তমানে মুসলমানরা যেসব সমস্যা মোকাবিলা করছে, তার সমাধান পাওয়া যাবে এবং সম্ভাব্য যেকোনো সংঘাত বা বিরোধপূর্ণ পরিবেশে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারবে।

এই ধরনের উদ্যোগ একটি প্রত্যাশিত এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আমরা যদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে একটি আন্তঃসংলাপ এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারা সূচনা করতে পারি, তাহলে বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি হতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান এবং অবদানকে ইতিবাচকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ারও প্রেক্ষাপট তৈরি হতে পারে। বর্তমানে আমরা যেভাবে বিভিন্ন সভ্যতাকে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত আছি—এটা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

ইতঃপূর্বে এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোওয়ে এম সাফি[৫] যেমনটা বলেছেন—ইসলামের সমন্বিত ও একীভূত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইসলামের স্বর্ণযুগে বিভিন্ন ধর্মের ও চিন্তাধারার শিক্ষাবিদদের মধ্যে নিয়মিত মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হতো। সেইসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে সব সময় সত্যকে জানার একটা আগ্রহ ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তঃবিশ্বাসবিষয়ক ধারণা, সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চর্চা থাকায় তারা চীন, ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা এবং গ্রিস থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছিল। পাশাপাশি নিজেদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানও মুসলমানদের সাহায্য করেছে। মুসলমানদের অবদানের ওপর ভিত্তি করে ইউরোপে রেনেসাঁস সংঘটিত হয়েছিল এবং বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের সংবিধানগুলোতে যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সংযোজন করা হয়েছে, তা মূলত মুসলমানদের কাছ থেকেই আমদানি করা।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা 'কোল্ড ওয়ার' হুট করেই থেমে যাওয়ার পরিণতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বিশ্ব চালকের আসনে সমাসীন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দুটো কৌশল রয়েছে। তারা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ধারক হতে পারে, আবার ডারউইনের 'সারভাইভাল অব দ্যা ফিটেস্ট' তত্ত্বকে ধারণ করে দুর্বলের ওপর চড়াও হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করতে পারে, আবার ক্ষুদ্র কোনো গোষ্ঠীর ফায়দা হাসিলের নিয়ামকও হতে পারে।

তারা বিশ্বজুড়ে একটি সমন্বিত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, আবার অসুস্থ প্রতিযোগিতাকেও ছড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি তারা ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আবার জোরপূর্বক তথাকথিত শান্তি প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিতে পারে।

বর্তমানে আমরা যে ইতিহাস পড়ছি, তা আমাদের এমন একটা ধারণা দিচ্ছে—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সবকিছু এসেছে গ্রিক ও রোমান সভ্যতা থেকে। এরপর একটি লম্বা গ্যাপ আছে। ইউরোপের রেনেসাঁস সংঘঠিত হওয়ার পর পৃথিবীতে আবারও সব উন্নয়ন শুরু হয়েছে। এই ধারণাটির মাধ্যমে মূলত সভ্যতার উন্নয়নে পশ্চিমা জগতের বাইরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের বসবসারত মানবগোষ্ঠীর অবদানকে অস্বীকার করা হয়। ইউরোপের উত্থানকে দেওয়া হয় বেশি গুরুত্ব। এ ধরনের একটি একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই মূলত প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হয়।

এক্ষেত্রে যারা শিক্ষাবিদ ও স্কলার আছেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে—সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাবিদরা সব সময়ই ধর্মীয় মূল্যবোধকে এড়িয়ে গিয়ে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সামাজিক, একাডেমিক এবং সাংস্কৃতিক অবদানকে অস্বীকার করে। ফলে ধর্মকে ধারণ করে এমন গোষ্ঠীগুলোর ব্যাপারে একধরনের নেতিবাচক ধারণার জন্ম নেয়। এ পরিস্থিতিতে ইতিহাসের সব ধরনের বিকৃতি এবং সভ্যতার সব ধরনের বিকৃত বয়ানকে সংশোধন করা প্রয়োজন।

নাইন-ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার পর দুর্বল দেশগুলোর ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অযাচিত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন বিশ্বজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ও ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে, অন্যদিকে আবার একটি সুযোগও তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামনে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন স্বাধীনতা, মানবাধিকার, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে আরও সম্পৃক্ত করার সুযোগ পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত আমেরিকার মুসলিম নাগরিক এবং বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার মাধ্যমে আমেরিকা গোটা পৃথিবীতেই শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হতে পারে। সভ্যতার সংঘাতের পথে না হেঁটে আমরা বরং ইসলামি সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করার চেষ্টা করি। একই সঙ্গে, পশ্চিমা বিশ্ব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্য-প্রযুক্তিতে যে অসামান্য অগ্রগতি সাধন করেছে, তার স্বীকৃতি দিয়ে এই দুই সভ্যতার মাঝে একটি সমন্বয় সাধনেরও চেষ্টা করতে পারি।

তথ্যসূত্র

1. Ibrahim Madkour, *Past, Present and Future*, in J.R. Hayes, *The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance* (Cambridge, MA: MIT Press, 1983), pp-243-246

2. Rose W. Lane, *Islam and the Discovery of Freedom* (Amana Publications, 1997) pp. 47-48

3. Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* (New York: Macmillan, 1986), p- 672

4. S. AbulHasan Nadvi, The Impact of the Rise and Fall of Muslims on Human Civilization) Karachi, Pakistan: Majlis-e-Nashariaat-e-Islam, 1974

5. Louay Safi, 'Overcoming the Religious-Secular Divide: Islam's Contribution to Civilization' Presented at the 2001 AMSS Regional Conference, Dallas, Texas, June 22-23

❖ ❖ ❖

অনুবাদক পরিচিতি

আলী আহমাদ মাবরুর।

পেশায় সাংবাদিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয়। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। মানারাত ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে কলা অনুষদের পক্ষে তিনিই একমাত্র গোল্ড মেডেলপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনেই যোগ দেন একটি জাতীয় দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে। পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ও নিউজ পোর্টালে কাজ করে যোগ দেন একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ইংরেজি সংবাদ বিভাগে। এরপর ফ্রিল্যান্সার হিসেবে অনুবাদ, ভয়েজ ওভার ও চিত্রনাট্য তৈরিসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। তার বেশ কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে–যা পাঠকমহলে বেশ সাড়া ফেলেছে।

বিশ্বসভ্যতা নির্মাণের একচ্ছত্র দাবিদার পশ্চিমারা। সেই দাবিকে ফোকাস করে তাদের হাতে নির্মিত ইতিহাসে একপাক্ষিক ভাষ্যের জয়জয়কার। খুব সচেতনভাবে তারা এড়িয়ে গেছেন মুসলমানদের অবদান। এই ধরনের অভিব্যক্তি মূলত ইতিহাসের জঘন্যতম বিকৃতি। তবে পশ্চিমারা ইতিহাসের লম্বা একটি সময়কে যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, ইতিহাস কখনোই নীরব ছিল না; থাকার সুযোগও নেই।

এর বিপরীতে আমাদের যদি সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকে, তাহলে পশ্চিমা জগতের জাহেলিয়াতি ও মিথ্যা দাবিকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে পারর। সেইসঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে ধরনের সহিংস, বর্বর ও অসভ্য ভাবমূর্তি তৈরি করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম জবাব দিতে সক্ষম হব। দেখাতে পারব আমাদের অসংখ্য সুপার হিরো কী পরিমাণ পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বিবেচনাবোধ ও পেশাদারিত্বের মধ্য দিয়ে নিজেদের কাজগুলোকে সম্পন্ন করে গেছেন। 'বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদান' বইটি তারই ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।